বাঙালীর পরিত্রাতা
শ্যামাপ্রসাদ

ড: দীনেশ চন্দ্র সিংহ

বাঙালীর পরিত্রাতা শ্যামাপ্রসাদ

ডঃ দীনেশ চন্দ্র সিংহ
ডেপুটি রেজিস্ট্রার (অবসরপ্রাপ্ত)
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

বিবেকানন্দ সাহিত্য কেন্দ্র
৬, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০৭৩

শ্যামাপ্রসাদ

শ্যামাজননীর মহাপ্রসাদ শ্যামাপ্রসাদ তুমি,
হয়েছে ধন্য তোমারে স্তন্য পিয়ায়ে বঙ্গভূমি।
তুমি আজ নাই, শুনিব না আর সিংহের গর্জ্জন।
সিংহবাহিনী অঝোরে অশ্রু করিছেন, বর্ষণ।
বহিয়াছ তুমি অবলের ভার সবল অংশ' পরে,
সহিয়াছ ক্লেশ বেদনা অশেষ দুর্গতিদের তরে।
মরণাহতের শ্মশানবন্ধু শরণাগতের ত্রাতা,
তোমারে হারায়ে পথভিখারিণী আজি তব দেশমাতা।
শিবিরে করনি বিশ্রাম কভু, যত দিন ছিলে বাঁচি,
ঘরে ও বাহিরে দুহাতে সমান যুঝেছ সব্যসাচী।
হে বরোদাত্ত, হে ভীমকান্ত, চিরচাপল্যহীন,
শফরীর হ্রদে অগাধ-সলিল-সঞ্চারী মহামীন।
ন্যায়-দেবতার বেদীতেই শুধু প্রণত তোমার শির
অসত্য সাথে সন্ধি করিতে পার নাই মহাবীর।
সারাটি দেশের বেদনার ভার বহিতে পারে কি দেহ?
ভূধরের সম দুর্বহভার সহিতে পারে কি কেহ?
বীরলোকে তুমি করিলে প্রয়াণ মোরা শোকে কাঁদি বৃথা,
দেশজননীরে কোন্ সান্ত্বনা দিয়ে গেলে বল, মিতা।

— কবিশেখর শ্রী কলিদাস রায়

মুখবন্ধ

শ্যামাপ্রসাদ বাঙালীর জন্য কি করেছেন?
তাঁকে স্মরণ করব কেন?

নামে-ধামে মানুষের পরিচয়। বাপ-মা সন্তান সন্ততির যে নাম রাখেন, তাদের বসবাসের জন্য যে ধাম বা বাস্তু রেখে যান, তার পরিচয়েই মানুষ পরিচিত হয়।

এসব কথা একজন ব্যক্তি বা একটি-পরিবারের পক্ষেই খাটে। কিন্তু একটা ভাষাগোষ্ঠীর লক্ষ লক্ষ পরিবারের কোটি কোটি নরনারীর পরিচয় দানের ব্যবস্থা যিনি করে গেছেন, তাঁকে সে জাতির পিতা না হোক, পরিত্রাতা হিসাবে পুরুষানুক্রমে স্বীকার করতেই হবে।

দেশভাগ ও স্বাধীনতা লাভের প্রাক্কালে বাংলার হিন্দুদের অস্তিত্ব-সঙ্কট দেখা দেয়। তাদের পরিচয় বিলুপ্ত হবার আশঙ্কা ঘটে। তাদের পায়ের তলার মাটি সম্পূর্ণ রূপে সরে যাবার উপক্রম হয়। কারণ সম্পূর্ণ বাংলাই পাকিস্তানে যাওয়ার ছক তৈরি হয়ে গেছে। সে সময় বাংলার হিন্দুদের পায়ের তলায় খানিকটা মাটি রক্ষা করতে এবং বাঙালী বলে, পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসী বলে, পরিচয় দানের জন্য পাকিস্তানের কবল থেকে পশ্চিমবঙ্গ নামক ভূমিখণ্ডটুকু যিনি রক্ষা করেছিলেন, তিনি ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জী।

অত্যন্ত দুঃখ ও পরিতাপের বিষয়, শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যুর ৫৪ বছরের মধ্যে তিনি কে ছিলেন, বাঙালীর জন্য কি করেছিলেন, তা বেশির ভাগ বাঙালীই স্মরণ করতে পারেন না। তাঁদের ব্যাখ্যা করে বলতে হয়। পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুরা কার দৌলতে পশ্চিমবঙ্গ নামক রাজ্যটিতে বসবাস করেছেন; কার দূরদর্শিতায় পূর্ববঙ্গের সর্বহারা হিন্দুরা পশ্চিমবঙ্গে এসে মান-ইজ্জত রক্ষা করতে পেরেছে, সে ইতিহাস বাঙালীর মন থেকে সম্পূর্ণরূপে মুছে দেবার ব্যবস্থা করেছে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার। যারা সম্পূর্ণ বাংলার পাকিস্তান ভূক্তির জন্য কোমর বেঁধে লড়েছিল, তাদের সে চক্রান্ত ব্যর্থ করে দিয়েছিলেন ডঃ মুখার্জী। সেই রাগেই তারা ডঃ মুখার্জীর নাম ও অবদান ইতিহাসের পাতা থেকে মুছে দেবার ব্যবস্থা করেছে।

কিন্তু ইতিহাস কাউকে ক্ষমা বা খাতির করে না। এই অকৃতজ্ঞ দল ও নেতাদেরও করেনি। মুসলমানদের খুশি করে রাজনৈতিক ফায়দা তুলতে যারা পাকিস্তান দাবী সমর্থন করেছিল, সে পাকিস্তান কায়েম হতেই মুসলমানরা স্বমূর্তি ধারণ করে এবং পূর্ববঙ্গের হিন্দু কংগ্রেস ও কমিউনিস্ট নির্বিশেষে ঠেঙিয়ে ঝাড়ে বংশে পাকিস্তান থেকে বিতাড়িত করে। এরা তখন অনেকে মানইজ্জত হারিয়ে, অনেকে বাঁচাবার তাগিদে শ্যামাপ্রসাদের আপ্রাণ চেষ্টায় রক্ষিত পশ্চিমবঙ্গেই আশ্রয় নিয়েছিল।

শ্যামাপ্রসাদ পশ্চিমবঙ্গের স্রষ্টা ও স্থপতি

বেশি দিন তো নয়, মাত্র ১৯৪৬-৪৭ সালের কথা। তখন ইংরেজ শাসনাধীন ভারতে অখণ্ড বঙ্গপ্রদেশে চলেছে মুসলিম লীগ দলের বর্বর শাসন। বাংলার হিন্দুরা মুসলমান গুন্ডাদের হাতে নির্মমভাবে নির্যাতিত হচ্ছে। তার উপর ব্রিটিশের অবর্তমানে নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তানে সম্পূর্ণ মুসলিম শাসনে হিন্দুদের কি চরম লাঞ্ছনা ও দুর্দশার সম্মুখীন হতে হবে, তা ভেবে শিউরে উঠল বাংলার হিন্দু সম্প্রদায়।

কিন্তু তারা কার কাছে যাবে, আশ্রয় চাইবে, আশ্বাস পাবে? গান্ধীজী দিশাহারা, কংগ্রেস নির্বাক, কমিউনিস্টরা পুরো বাংলা পাকিস্তানে যাওয়ার পক্ষে ওকালতি করেছে। তাদের স্লোগান 'পাকিস্তান মানতে হবে তবেই ভারত স্বাধীন হবে'। বাংলার জেলায় জেলায় হিন্দুনারীর লাঞ্ছনা ও নির্যাতনের খবর আসছে। বাড়িঘর, দোকানপাট, বিষয়সম্পত্তি লুটপাট ও পুড়িয়ে দেবার সংবাদ আসছে। খুনখারাপি তো জল ভাত। এমন বিপর্যয়কর অবস্থায় হিন্দুজাতি পলাশি যুদ্ধে সিরাজউদ্দৌল্লার পতনের পরে আর পড়েনি। চারদিক থেকে কেবল বাঁচাও, বাঁচাও আর্তনাদ ভেসে আসছে হিন্দুদের পক্ষ থেকে।

তখন শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী নির্ভিক কণ্ঠে ডাক দিলেন—"অন্যায়ের প্রতিবাদ করো প্রতিরোধ করো, প্রয়োজনে প্রতিশোধ নাও।" তিনি অকাট্য যুক্তি দেখিয়ে বললেন, মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতার অজুহাতে একটা প্রদেশ যদি ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পাকিস্তানে যেতে পারে, তা হলে সেই একই যুক্তিতে সেই প্রদেশের হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলাগুলি কেন ভারতের সঙ্গে থেকে যাবে না?

এই প্রশ্নে শ্যামাপ্রসাদ দুর্বার আন্দোলন গড়ে তুললেন। তাঁর যুক্তির বিরুদ্ধে গান্ধী-নেহরু-জিন্না-ওয়াভেল-মাউন্টব্যাটেন কোনও যুক্তিই খাড়া করতে পারেননি। মুসলিম লীগ নিজ অস্ত্রে নিজেরাই ঘায়েল হল। বাংলা ও পাঞ্জাবের হিন্দু অধ্যুষিত জেলাগুলি-মুসলিম অপ-শাসনের হাত থেকে রক্ষা পেল। মিঃ জিন্নাকে 'পোকা-কাটা' পাকিস্তান নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হল। আর সে কারণেই পাক-দরদী হিন্দুরা উঠতে বসতে শ্যামাপ্রসাদকে সাম্প্রদায়িক বলে গাল পাড়ে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের জাতীয়তাবাদী-হিন্দুরা এবং পূর্ববঙ্গ থেকে সর্বহারা লক্ষ লক্ষ হিন্দু শ্যামাপ্রসাদকে পরিত্রাতা বলেই মনে করে। ১৯৪৬-৪৭-এর পর ১৯৫০, ১৯৬৪, ১৯৭১-৭২, ১৯৯২, ১৯৯৯ ও ২০০১ সালেও ইসলামী বাংলাদেশে এক শ্রেণীর মুসলমানের পাশব অত্যাচারের হাত থেকে প্রাণ বাঁচাতে মান বাঁচাতে, যারা ছুটে এসেছিল, তারাও আশ্রয় পেয়েছিল শ্যামাপ্রসাদের মরণপণ সংগ্রামে রক্ষিত এই পশ্চিমবঙ্গেই! পশ্চিমবঙ্গ নামক এই ক্ষুদ্র অঞ্চলটুকু মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার কবল থেকে ছিনিয়ে না রাখলে, সারা বাংলার হিন্দুরা কোথায় গিয়ে দাঁড়াত?

শ্যামাপ্রসাদ বাংলার হিন্দু-মুসলিম উভয় শ্রেণীকে বাঁচিয়েছেন। জানি, একথার জবাব দেবার মুখ নেই এই বঙ্গে। কিন্তু জবাব দিয়েছে বাংলাদেশের নতুন প্রজন্মের বুদ্ধিজীবিরা।

তবে সে বিষয়ে যাবার আগে শেষ বিচারে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীকেই বাংলার হিন্দু সমাজের রক্ষক এবং পশ্চিমবঙ্গের স্থপতি বলা যায়। বাংলা ভাগ ও পশ্চিমবঙ্গ সৃষ্টিতে মদত দিয়ে শুধু হিন্দুদের নয়, মুসলমানদেরও কি মহোপকার সাধন করেছেন, সেকথা বাংলাদেশী বুদ্ধিজীবিরা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করেছেন ।

" একসময় আমি যুক্তবাংলার থিয়োরিতে দারুণভাবে বিশ্বাসী ছিলাম। ১৯৪৭ সালে ভারত ভাগের প্রাক্কালে অবিভক্ত বাংলার দুই নেতা শরৎ বসু ও শহিদ সোহরাওয়ার্দী পাকিস্তান ও ভারত ডমিনিয়নের বাইরে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন যুক্তবাংলা গঠনের প্রস্তাব দিয়েছিলেন, যা বসু-সোহরাওয়ার্দী প্রস্তাব নামে খ্যাত। 'আমি বিশ্বাস করতাম, বাঙালি জাতির ধর্মনিরপেক্ষতার অস্তিত্ব রক্ষা এবং বাঙালির সমন্বিত ভাষা কৃষ্টি রক্ষার সর্বোত্তম ব্যবস্থা হতো যুক্ত বাংলা গঠিত হলে। এই যুক্তবাংলা যাতে না হয় সেজন্যে প্রধান ভূমিকা নিয়েছিলেন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। এজন্যে তাঁর প্রতি আমার তীব্র বিদ্বেষ ও বিরূপ মনোভাব ছিল। আমার বহু লেখায় আমি তাঁর তীব্র সমালোচনা করেছি'।

'১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার ত্রিশ বছর পর আজ আমি শ্যামাপ্রসাদের দূরদৃষ্টিকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি। তিনি হিন্দু মহাসভার নেতা ছিলেন। সাম্প্রদায়িক রাজনীতি করতেন। কিন্তু ১৯৪৬ সালে ভারত ভাগের প্রাক্কালে যে কাজটি করে গেছেন, তাতে অবিভক্ত বাংলার একটি অংশে (পশ্চিমবঙ্গ) অন্তত গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা রক্ষা পেয়েছে। সাম্প্রদায়িকতার দানবকে সম্পূর্ণভাবে না হলেও বহুলাংশে পরাভূত করা সম্ভব হয়েছে। ভারতে যদি আজ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যটির অস্তিত্ব না থাকত, তাহলে স্বাধীন হওয়ার সাড়ে তিন বছর পরেই ফৌজি শাসক ও ধর্মীয় মৌলবাদীদের স্বর্গরাজ্যে পরিণত বাংলাদেশের নির্যাতিত সংখ্যালঘুদের, এমনকী ধর্মনিরপেক্ষতা ও গণতন্ত্রে বিশ্বাসী মুসলমান রাজনীতিক, বুদ্ধিজীবীদের আত্মরক্ষার ও আশ্রয় গ্রহণের দ্বিতীয় কোনও নিরাপদভূমি থাকত না'।

'পূর্ববঙ্গ পূর্ব-পাকিস্তান হওয়ার পর যে দেড়-কোটি সংখ্যালঘু নর-নারীকে বাস্তুভিটা ত্যাগ করতে হয়েছিল, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ছাড়া ভারতের আর কোন রাজ্য তাদের স্বেচ্ছায় এবং সাদরে গ্রহণ করত? পাকিস্তানের সামরিক শাসনামলে শাসকদের কোপানল থেকে বাঁচার জন্য শুধু সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ নয়, পূর্ব-পাকিস্তানের অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দলগুলোর (বিশেষ করে আওয়ামি লিগ ও কম্যুনিস্ট পার্টি) অসংখ্য নেতা-কর্মী কি পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় নেননি? সব চাইতে বড় উদাহরণ ১৯৭১ সাল। পাকিস্তানের হানাদার সৈন্যদের গণহত্যার ভয়াবহ তাণ্ডব থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য পাকিস্তানের নবনির্বাচিত পার্লামেন্টের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালি এম পি'কে পশ্চিমবঙ্গে গিয়ে আশ্রয় নিতে হয়েছিল। মওলানা ভাসানী থেকে তাজউদ্দীন আহমদ-গোটা মুজিব নগর সরকার এবং তার সামরিক ও অসামরিক অফিসারেরা (জেনারেল জিয়াউর রহমানসহ) আশ্রয় পেয়েছিলেন পশ্চিমবঙ্গে। সোয়া কোটি বাঙালি শরণার্থী (হিন্দু-মুসলমান-খ্রিষ্টান নির্বিশেষে) প্রথমে এসে ঢুকেছিল পশ্চিমবঙ্গ, অসম

ও মেঘালয়ে। বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামে প্রত্যক্ষ সাহায্য দেওয়ার জন্য ভারতে ইন্দিরা সরকারের উপর সব চাইতে বেশি চাপ সৃষ্টি করেছিল পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে শিল্পী, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবিরাই।'

'আমি আজ ভাবতেও পারি না, ১৯৭১ সালের সেই চরম দুর্দিনে ভারতে পশ্চিমবঙ্গ নামে একটি বাংলা ভাষাভাষী রাজ্য পাশে না থাকলে, পাশে না দাঁড়ালে বাংলাদেশের মানুষের অবস্থা কী হত ? মাত্র দশ মাসে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জিত হত কি না ? ১৯৪৬ সালে যদি বসু-সোহরাওয়ার্দী পরিকল্পনা অনুযায়ী যুক্তবাংলা প্রতিষ্ঠিত হত, তাহলে পাকিস্তান গোটা অবিভক্ত বাংলাই হয়তো সুকৌশলে তার প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ উপনিবেশে পরিণত করত। ত্রিশ বছরের মধ্যে গোটা অবিভক্ত বাংলাদেশ জুড়েই হয়তো শুরু হত ধর্মীয় মৌলবাদী তাণ্ডব। তখন হয়তো শুধু নিপীড়িত সংখ্যালঘুদের নয়, সেক্যুলার জাতীয়তায় বিশ্বাসী সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের মানুষেরও আশ্রয় নেওয়ার নিরাপদ স্থান থাকত না'। (আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী)

শ্যামাপ্রসাদকে সাম্প্রদায়িক বলে গালমন্দ করে থাকে মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার তোষণ-পোষণকারী কংগ্রেস ও কমিউনিস্ট দলগুলি। মুসলমানদের জাতীয় জীবনের মূলস্রোতে টেনে না এনে তাদের আলাদা রেখে, তাদের স্বার্থরক্ষার নকল গার্জেন সেজে মন ভিজিয়ে আখেরে ভোট ব্যাঙ্ক স্ফীত রাখার উদ্দেশ্য নিয়েই এই দলগুলি মুসলমানদের জন্য মায়া কান্না কাঁদে এবং হিন্দু জাতীয়তাবাদীদের, বিশেষ করে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীকে সাম্প্রদায়িক বলে নিন্দা-মন্দ করে আত্মপ্রসাদ লাভ করে। কিন্তু মুসলিম সমাজের নেতারা কি বলেন, তা একজন বিশিষ্ট মুসলমান নেতার জবানীতেই শোনা যাকঃ

প্রগ্রেসিভ কোয়েলিশন

"এর কয়েকদিন পরেই হক সাহেব আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং 'নবযুগে' প্রচারের নতুন ধারা সম্পর্কে আমাকে নির্দেশ দিলেন। এই নির্দেশ দিতে গিয়েই তিনি সর্বপ্রথম আমাকে জানান যে শুধু কৃষক-প্রজা ও কংগ্রেসের সাথেই তিনি আপোস করিতেছেন না। হিন্দু মহাসভা-নেতা ডঃ শ্যামাপ্রসাদের সাথেও তাঁর আপোস হইতেছে। ডঃ শ্যামাপ্রসাদকেও তিনি তাঁর নয়া মন্ত্রিসভায় নিতেছেন। আমি শুধু আকাশ হইতে পড়িলাম না। আস্ত আসমানটাই আমার মাথায় পড়িল। আমি জানিতাম হক সাহেব সময়-সময় খুবই বেপরোয়া হইতে পারেন। কিন্তু এতটা হইতে পারেন, এতকাল তাঁর শাগরেদি করিয়াও আমি তা জানিতাম না। কথাটা শুনিয়া আমি এমন স্তম্ভিত হইলাম যে সে-ভাব কাটিতে বোধ হয় আমার পুরা মিনিট খানেকই লাগিয়াছিল। তিনি আমার মনোভাব বুঝিলেন। গম্ভীর মুখে বলিলেনঃ 'শোন আবুল মনসুর, তুমি শ্যামাপ্রসাদকে চেন না। আমি চিনি। সে স্যার আশুতোষের বেটা। করুক সে হিন্দুমহাসভা। কিন্তু সাম্প্রদায়িক ব্যাপারে তার মত উদার ও মুসলমানদের হিতকামী হিন্দু কংগ্রেসেও একজনও পাবা না। আমার কথা বিশ্বাস কর। আমি সবদিক ভাইবা-চিন্ত্যাই তারে নিতেছি। আমারে যদি বিশ্বাস কর, তারেও বিশ্বাস করতে হবে।'

আমি খুবই চিন্তায় পড়িলাম। কিন্তু মনে-মনে হাসিলাম। ভাবিলাম, শ্যামাপ্রসাদকে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্নই উঠে না। কারণ স্বয়ং হক সাহেবকেই বিশ্বাস করা যায় না। শ্যামাপ্রসাদকে বিচার করিবার কি অমূল্য মাপকাঠিই না হক সাহেব আমাকে দিয়াছেন" (আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছরঃ আবুল মনসুর আহমদ)।

শ্যামাপ্রসাদের সঙ্গে মেলামেশার পর আবুল মনসুর আহমদ-এর প্রতিক্রিয়াঃ "আমি তাঁর সাথে কয়েকদিন মিশিয়াই বুঝিয়াছিলাম, তাঁর সম্বন্ধে হক সাহেব যা বলিয়াছেন, তা ঠিক। সাম্প্রদায়িক ব্যাপারে সত্য-সত্যই তিনি অনেক কংগ্রেসী নেতার চেয়েও উদার। হিন্দু মহাসভার নেতা হইয়াও কোনও হিন্দু নেতার পক্ষে মুসলমানদের প্রতি এমন উদার মনোভাব পোষণ করা সম্ভব, আমার এ অভিজ্ঞতা হইল প্রথমে ডঃ শ্যামাপ্রসাদকে দেখিয়া।"(ঐ)

জন্মাবধি এই উদার মনোভাবের অধিকারী ছিলেন বলেই অসুস্থ নজরুলের প্রতি ফজলুল হক, নাজিমুদ্দীন, সুরাবর্দী প্রমুখ তালেবর মিঞারা যখন মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন, তখন কবি জুলফিকার হায়দারের কাছে খবর পাওয়া মাত্র শ্যামাপ্রসাদ অসুস্থ কবিকে দেখতে ছুটে যান এবং সোনার দোকান থেকে টাকা ধার করে কবির চিকিৎসা ও কবিদম্পতির মধুপুর বাসের ব্যবস্থা করেন।

শ্যামাপ্রসাদ মুসলিম লীগের রাজনীতির বিরোধী ছিলেন, কিন্তু তাঁর ভাষণে বক্তৃতায় রচনায় কোথাও মুসলিম বিদ্বেষের প্রমাণ দেখতে পাওয়া যায় না। তিনি কখনও মুসলিম ধর্ম সংস্কৃতি সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করেননি। মুসলিম বিদ্বেষী হলে তিনি ইসলামী ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ স্থাপনে উদ্যোগী হতেন না; কিংবা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার মহানায়ক হোসেন সুরাবর্দীর বড় ভাই ডঃ হাসান শহীদ সুরাবর্দীকে নিয়ম পরিবর্তন করে বাগীশ্বরী অধ্যাপক পদে নিয়োগ করতেন না। আর হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের প্রতি আন্তরিক আহ্বান জানিয়ে বলতেন না— "Let each of them follow his own religion, pursue his own culture, contribute to the growth of a common civilisation imbibing the best elements of both. Let them regard themselves not as belonging to two separate nations that cannot amicably live together, but as two arms of the great mother which by virtue of their strength and unity will protect her truest interests now and for generations to come."

এ উপমহাদেশে কোনও হিন্দু বা মুসলমান নেতার মুখ থেকে এমন গভীর আন্তরিকতা পূর্ণ আহ্বান শোনা গেছে কি?

মাত্র ১৩ বছরের রাজনীতিক জীবনে শ্যামাপ্রসাদ যে আলোড়ন তুলে দিয়েছিলেন, আজও তা স্তিমিত হয় নি; এবং পশ্চিমবঙ্গ নামক ভূখণ্ড যতদিন বর্তমান থাকবে ততদিন সে তরঙ্গ বিক্ষেপ থামবে না একথা নিশ্চিত বলা যায়।

১লা বৈশাখ
১৪১৫

ডঃ দীনেশচন্দ্র সিংহ

নিবেদন

পশ্চিমবঙ্গ মহা বিপর্যয়ের সম্মুখীন; সর্বনাশের দিকে এগিয়ে চলেছে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে। বাঙালী হিন্দু এমনি বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছিল ঠিক ষাট বছর পূর্বে (১৯৪৬-৪৯)। অর্থাৎ স্বাধীনতা প্রাপ্তির প্রাক্কালে যার হীরক জয়ন্তী পালিত হল এ বছর। সে সময় বাঙালী জাতিকে স্বাধীনতার জন্য চরম মূল্য দিতে হয়েছিল। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় হাজার হাজার হিন্দু নিহত হচ্ছে বাঙালী মা-বোনের ইজ্জত নষ্ট হচ্ছে, বিষয় সম্পতি বিনাশের ছিলনা সীমা পরিসীমা। লক্ষ লক্ষ হিন্দু বাস্তুচ্যুত হচ্ছে। তাদের ধর্ম-সংস্কৃতি বিনষ্ট হচ্ছে। তখন কংগ্রেস অসহায় নীরব দর্শক; কমিউনিষ্টরা সম্পূর্ণ বাংলা পাকিস্তানে যাবার সমর্থক। বাঙালী হিন্দুর রক্ষক বলতে কেউ নেই। ব্রিটিশ বিতাড়নে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণকারী হিন্দুর এই চরম দুর্দশায় ব্রিটিশ সরকার দূরে দাঁড়িয়ে মজা দেখছে।

ইতিমধ্যে ভারত ভাগের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় দাবী তুললেন, যে যুক্তিতে দেশ ভাগ হয়েছে, সেই একই যুক্তিতে প্রদেশও (অর্থাৎ বাংলা, পাঞ্জাব) ভাগ করতে হবে। হিন্দু প্রধান জেলাগুলিকে কোনও মতেই পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত করা চলবে না। সেগুলিকে ভারতের সঙ্গে যুক্ত রাখতে হবে। শ্যামাপ্রসাদ গড়ে তুললেন তীব্র গণ আন্দোলন। তারই ফলে পূর্ব ও পশ্চিম উভয় বঙ্গের হিন্দুদের মানইজ্জত রক্ষার শেষ আশ্রয়স্থল হিসাবে পশ্চিমবঙ্গ নামক রাজ্যটির সৃষ্টি হল। বানচাল হয়ে গেল সুরাবর্দী শরৎবসুর অবাস্তব ও হিন্দু স্বার্থ বিরোধী স্বাধীন যুক্তবঙ্গ পরিকল্পনা।

আর এই মহাকাণ্ডের মহানায়ক ছিলেন ড: শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। বাংলার নতুন প্রজন্ম প্রায় ত্রিশ বছর ধরে বাংলার শিক্ষা ও সংস্কৃতি জগতের অন্যতম নিয়ন্তা এবং রাজনৈতিক জগতের কেন্দ্রবিন্দু শ্যামাপ্রসাদের স্বল্পকালীন অথচ কর্মমুখর জীবনকাহিনী সম্পর্কে তেমন কিছু জানেনা বললেই চলে। তাদের অগ্রগতির জন্য এবং সেই দুর্যোগময় দিনে শ্যামাপ্রসাদের মতো বিরাট ব্যক্তিত্বের অবদানের সঙ্গে নতুন প্রজন্মের পরিচয় দানের উদ্দেশ্য নিয়েই স্বাধীনতার হীরক জয়ন্তী বর্ষে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ প্রকাশের পরিকল্পনা।

সেই উদ্দেশ্য কিঞ্চিৎ পরিমানে সাধিত হলেই প্রকাশের প্রচেষ্টা সার্থক বলে মনে করা হবে।

"বন্দে মাতরম্"

প্রকাশক

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

বংশ পরিচয়

ভাগীরথীর পশ্চিম উপকূলে হুগলি জেলায় জিরাট-বলাগড় নামে একখানি গ্রাম আছে। ঐ গ্রামের এক সদ্‌ব্রাহ্মণ বংশে ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দের ১৭ই ডিসেম্বর আশুতোষের পিতা ও শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের পিতামহ গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন।

ঐ জিরাট গ্রাম কিন্তু গঙ্গাপ্রসাদের পিতৃপুরুষের আদি বাসভূমি নয়। এই বংশের আদিপুরুষ ছিলেন রামায়ণের বঙ্গানুবাদক ফুলিয়ানিবাসী কৃত্তিবাস ওঝার এক ভাই। তাঁর নিবাস ছিল হুগলি জেলার দিগসুই গ্রামে। খন্যান স্টেশন থেকে অনুমান তিন চার ক্রোশ দূরে। সেই বংশে গঙ্গাপ্রসাদের বাবা অর্থাৎ শ্যামাপ্রসাদের প্রপিতামহ বিশ্বনাথের জন্ম ১৭৮৭ সালের ১৮ই অক্টোবর। জন্মের অল্পদিন পরে তিনি পিতৃহীন হন। শিশু পুত্রটিকে নিয়ে সদ্য বিধবা জননী তাঁর পিত্রালয়ে ঐ জিরাট গ্রামে চলে আসতে বাধ্য হন। বিশ্বনাথ সেইখানে তাঁর মামার বাড়িতে প্রতিপালিত হতে থাকেন।

মাতুলের অবস্থা সচ্ছল ছিল না। তাই, স্নেহ যত্ন আদরের অভাব না থাকলেও বিশ্বনাথের বাল্যজীবন সুখের ছিল না। অল্প শিক্ষালাভের পর তাঁকে উপার্জনের সন্ধানে প্রবাসে নানা স্থানে ঘুরতে হয়। পরে কিছু রোজগার শুরু হলে জিরাটে নিজের বাসভবন তৈরি করেন। বিশ্বনাথের বিবাহ হয় বর্ধমানের রাজার সভাপণ্ডিত সার্বভৌম চট্টোপাধ্যায়ের দৌহিত্র রামমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা ব্রহ্মময়ীর সঙ্গে। ব্রহ্মময়ী ছিলেন অতি পুণ্যশীলা। ১৮৪২ সালে জিরাট থেকে গ্রামের কয়েকজন সঙ্গিনীর সঙ্গে তিনি পায়ে হেঁটে পুরী তীর্থযাত্রা করেন। তখনও পুরী যাতায়াতের রেলপথ তৈরি হয়নি। সেখানে স্নানযাত্রায় জগন্নাথ-দর্শনলাভের কিছুকাল পরেই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। সেই তীর্থক্ষেত্রেই পুণ্যবতীর দেহাবসান হয়। গঙ্গাপ্রসাদের তখন মাত্র ছয় বছর বয়স।

সাত বছর পরে জিরাট গ্রামে বিশ্বনাথেরও মৃত্যু ঘটে এক দুর্ঘটনার ফলে। ১৮৪৯ সালে একদিন তিনি সেখানে গঙ্গায় যখন স্নান-আহ্নিক করতে নেমেছেন, হঠাৎ এক নৌকার মাস্তুল ভেঙে পড়ে। মাথায় তিনি গুরুতর আঘাত পান। মাসখানেক শয্যাশায়ী থাকার পর ১৫ই অক্টোবর, শ্যামাপূজার চতুর্দশীতে তিনি পরলোকগমন করেন। গঙ্গাপ্রসাদের বয়স তখন তেরো বছর। তাঁর জীবনের প্রভাতকালেই যেন অমানিশার ঘোর অন্ধকার নামে।

তাঁর জ্যেষ্ঠভ্রাতা দুর্গাপ্রসাদের বয়স তখন মাত্র সতের। মধ্যম হরিপ্রসাদ পনের বছরের। সর্বকনিষ্ঠ রাধিকাপ্রসাদ দশ বছরের। সেই বাপ-মা হারা বালকগুলির অতি কষ্টেই দিন কাটাতে হয়। জাহ্নবী নামে এক কায়স্থ মহিলা সেই নাবালকদের লালনপালন করেন। তাঁরই যত্ন ও চেষ্টার ফলে তারা মানুষ হতে থাকে।

পিতা বিশ্বনাথের শেষ জীবনে কোন চাকরি না থাকায় তিনি ঋণগ্রস্ত হন। দুর্গাপ্রসাদ সেই দায়িত্বভারে দুশ্চিন্তিত হয়ে গ্রাম ছেড়ে শহরে এসে চাকরি করতে বাধ্য হলেন। ভাইদেরও

সঙ্গে আনেন। পরবর্তী কালে দুর্গাপ্রসাদ পিতার সেই ঋণ, আইনত তামাদি হলেও, পরিশোধ করে দেন। ভাইরাও জিরাটের বাড়ির নিজ নিজ স্বত্ত্ব দুর্গাপ্রসাদের অনুকূলে লিখে দেন।

দুর্গাপ্রসাদ গ্রাম থেকে এসে প্রথমে আন্দুল স্কুলে শিক্ষকতা করেন। তিন ভাইকেও ঐ স্কুলে ভর্তি করে দেন। নিজে রেঁধে ভাইদের খাওয়ান। অবসর পেলেই তাঁদের পড়ান। কিছুকাল এইভাবে শিক্ষকতা করার পর তিনি বিভিন্ন স্থানে ওভারসিয়ার ও ইঞ্জিনিয়ারের কাজ শুরু করেন। ভাইদেরও কোন রকমে কলকাতায় বাসাভাড়া করে থাকবার ব্যবস্থা হয়।

এখনকার মহানগরী কলকাতায় যে দিকে দিকে প্রশস্ত রাজপথ, সারি সারি বিশাল বাড়ি, পথ-ঘাট লোকে লোকারণ্য, ট্রাম-বাস মোটরের হুড়াহুড়ি, দেড়শ বছর আগে কলকাতার এ চেহারাই ছিল না। সে শহর ছিল জঙ্গলে ভরা, বাসের অযোগ্য বাড়ি ঘর, অপরিচ্ছন্ন দুর্গন্ধময় রাস্তাঘাট। নানান রোগের লীলাক্ষেত্র। কলকাতায় এলে পেটের অসুখে আক্রান্ত হওয়াই ছিল যেন নিয়ম। বহু কষ্ট সহ্য করে অনেকে নিজের হাতে রেঁধে খেতেও বাধ্য হতেন। গঙ্গাপ্রসাদ এই সব অসুবিধার কথা কিছু কিছু জানলেও এই শহরে থেকে লেখাপড়া শিখতে উদ্যোগী হলেন। কষ্টভোগের ভয়ে দমে যাবার মত মন ছিল না তাঁর।

গঙ্গাপ্রসাদের বিদ্যানুরাগে অনেক চেষ্টার পর তিনি হেয়ার সাহেবের স্কুলে ভর্তি হলেন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। সেই বছরই তিনিও প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করেন। গঙ্গাপ্রসাদ ছিলেন অসাধারণ মেধাবী, পড়াশুনায় গভীর মনোযোগী। স্কলারশিপ পরীক্ষা দিয়ে বৃত্তি লাভ করলেন ও ফ্রি-স্টুডেন্টশিপ পেয়ে প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হলেন। গঙ্গাপ্রসাদের ছাত্রজীবন ঘোর অভাব ও দৈন্যের মধ্যে কাটে। আর্থিক অনটনের জন্য বাসা-বাড়িতে রাত্রে অনেকদিন আলো জ্বালাবার তেল থাকত না। রাস্তার ল্যাম্পপোস্টের নীচে দাঁড়িয়ে বা নিকটস্থ মুদির দোকানে বসে তাঁকে পাঠ্যপুস্তক পড়তে হতো। তবুও, বিভিন্ন পরীক্ষায় তিনি বৃত্তিলাভ করে আপন মেধার পরিচয় দিতে থাকেন। নিজেদের ভরণপোষণেরও কিছুটা উপায় হয়।

গঙ্গাপ্রসাদের চারিত্রিক গুণাবলীর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য,—তাঁর অধ্যবসায় ও অটল সঙ্কল্প। 'ভাল করে শেখা চাই'—এই ছিল তাঁর জীবনের মূলমন্ত্র। যে কাজে একবার হাত দিতেন সে কাজের খুঁটিনাটি সমস্ত বিষয় জেনে কাজটি সম্পূর্ণ করে তবে তিনি বিরত হতেন। বহু বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করে ১৮৬১ সালে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের বি.এ. পরীক্ষা পাশ করলেন।

আমাদের এখনকার সমাজে যে স্রোত চলেছে তার প্রবল টানে বাঙালীরা আর অপরের জন্য ভাববার অবকাশ পায়না। নিজের জীবনের নানান সমস্যার ভাবনাতেই তাদের দিন কাটে। কিন্তু সে যুগে মানুষের মন ছিল ভিন্ন। লেখা পড়া শিখে অন্নের চিন্তায় এখনকার মত এমন করে ঘুরতে হোত না। অপরের উপকার করা তখন ছিল বাঙালী জীবনের এক প্রধান কর্তব্য।

বি. এ. উপাধি লাভ করে গঙ্গাপ্রসাদ ইচ্ছা করলে সে যুগে সরকারী চাকরি করতে পারতেন। সেকালে বি. এ পাশ করতে পারলে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বা ঐ ধরনের লোভনীয় চাকরি সহজেই পাওয়া যেত। কিন্তু, চাকরির লোভ গঙ্গাপ্রসাদের ছিল না। স্বাধীন ব্যবসা করবেন ভেবে ব্যারিস্টার মনট্রিও সাহেবের কাছে আইন পড়তে আরম্ভ করেন। কিন্তু, দেশবাসীর স্বাস্থ্যের দুরবস্থা দেখে পীড়িতের সেবার মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে সেই বছরেই আইনের পথ ছেড়ে তিনি চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষার জন্য মেডিকেল কলেজে ভর্তি হলেন।

আশুতোষের জন্ম ঃ মেডিকেল কলেজে ছাত্রাবস্থাতেই গঙ্গাপ্রসাদের বিবাহ হয় হরিলাল চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা জগৎতারিণীর সঙ্গে। ১৮৬৪ সালে তিনি যখন কলেজের তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র সেই সময়ে ২৮শে জুন, মঙ্গলবার, ভোরে বৌবাজার মলঙ্গা লেনের বাসাবাড়িতে তাঁদের প্রথম সন্তান আশুতোষের জন্ম। তার পরেও যে দু' বছর গঙ্গাপ্রসাদ কলেজে পড়েন, তার অনেক সময় শিশু আশুতোষ তাঁর মায়ের সঙ্গে তাঁর মামার বাড়ি সিমলা কাঁসারিপাড়ায় থাকতেন। ছেলেবেলায় তিনি রুগ্ন ও দুর্বল ছিলেন। তাঁর মা তাঁকে অনেক যত্নে লালন-পালন করে বাঁচিয়ে রাখেন।

১৮৬৬ সালে গঙ্গাপ্রসাদ কৃতিত্বের সঙ্গে এম বি পাশ করেন। এবারও তাঁর পক্ষে সরকারী চাকরি পাওয়া কঠিন ছিল না, তবুও তিনি স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জন করাই ভাল মনে করলেন।

গঙ্গাপ্রসাদের দেশাত্মবোধ ঃ পরবর্তী প্রজন্মেও সংক্রামিত এই সময়কার এক ঘটনা গঙ্গাপ্রসাদের দেশাত্মবোধ ও আত্মসম্মানজ্ঞানের প্রকৃষ্ট পরিচয় দেয়। মেধাবী ছাত্র বলে গঙ্গাপ্রসাদ মেডিকেল কলেজের ইংরেজ অধ্যক্ষের ও অধ্যাপকদের প্রিয় ছিলেন। অধ্যাপক প্যাট্রিজ সাহেব তাঁর অধ্যবসায়, মনস্বিতা ও চিকিৎসাবিদ্যায় পারদর্শিতা প্রভৃতি গুণে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে বিলাত পাঠানোর প্রস্তাব জানান, কিন্তু তা কার্যকরী হয়নি। কলেজের অধ্যক্ষ চার্লস সাহেব গঙ্গাপ্রসাদের সাংসারিক অসচ্ছলতার কথা ভেবে তাঁকে সরকারী চাকরি নিতে পরামর্শ দেন এবং ভাইসরয়ের মিলিটারী সেক্রেটারীর নামে এক সুপারিশপত্র লিখে দিয়ে গঙ্গাপ্রসাদকে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পাঠান।

চাকরি করার ইচ্ছা না থাকলেও, শুভাকাঙ্ক্ষী শিক্ষকের নির্দেশ পালন করে সেই বড় সাহেবের সঙ্গে গঙ্গাপ্রসাদ সাক্ষাৎ করতে যান। তাঁর পরনে ছিল যথারীতি বাঙালীর বেশ, পরিচ্ছন্ন ধোপদুরস্ত ধুতিজামা। সাহেব গঙ্গাপ্রসাদের গুণাবলীর পরিচয়ে সন্তুষ্ট হলেও তাঁর ঐ 'নেটিভ' বেশভূষা দেখে বিরক্ত হন; প্রশ্ন করেন, আপনি কি এই পোশাকে সরকারী ডাক্তার হতে চান? গঙ্গাপ্রসাদ উত্তর দেন, অবশ্যই। এই তো আমাদের জাতীয় পোশাক।—সাক্ষাৎকারেরও ঐখানেই সমাপ্তি ঘটে। ফিরে এলে অধ্যক্ষ ফলাফল জানতে চাইলে গঙ্গা প্রসাদ জানান, সেই সাহেব তো ডাক্তার খুঁজছেন না,—তিনি চান, এক জোড়া সাহেবী কোট-প্যান্ট।

পিতা গঙ্গাপ্রসাদের চালচলনে, স্বভাবে আচারে এই খাঁটি বাঙালী মনোভাব ও স্বজাতিকতা পুত্র আশুতোষের জীবনেও পরিষ্কার ফুটে ওঠে। হাইকোর্টে জজিয়তি করার সময়টুকু ছাড়া

তিনি কখনও প্যান্ট ব্যবহার করতেন না। সভা সমিতিতে ত বটেই, এমন কি লাটসাহেবদের আসরে যোগ দিতে বা তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সময়ও তিনি সর্বত্রই বাঙালীর বেশেই যেতেন। বাড়িতে সাহেবরা দেখা করতে এলেও খাটো থান ধুতি-পরা খালি গায়ে নিঃসঙ্কোচে তাঁদের সঙ্গে আলাপ করতেন।

ডাক্তারি পাশ করার পর ১৮৬৬ সালেই গঙ্গাপ্রসাদ শুরু করেন ডাক্তারি এবং অল্পদিনের মধ্যেই সুচিকিৎসক হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। যথেষ্ট অর্থাগমও হতে থাকে। তিনি তখন ৭৭নং রসা পাগলা রোডে (পরে রসা রোড নর্থ ও বর্তমানে আশুতোষ মুখার্জী রোড) নিজ বসত বাড়ি করেন এবং ১৮৭৩ সালের এপ্রিল মাসে (১লা বৈশাখ) সেই বাড়িতে গৃহপ্রবেশ করেন। চিকিৎসা পেশা দিয়ে যাত্রা শুরু হলেও অনতিকাল মধ্যে এই ৭৭নং বাড়ি সারা ভারতে আইন, শিক্ষা ও রাজনীতির পীঠস্থানে পরিণত হয়েছিল।

অলৌকিক প্রতিভাধর আশুতোষ

আশুতোষ বহুগুণের অধিকারী জনকজননীর ভাগ্যবান সন্তান। তাঁর মা সাধারণ মহিলাদের মত ছোট বিষয় নিয়ে সময় নষ্ট করতেন না। বালক আশুতোষ মায়ের কাছে লেখা পড়া শিখতেন, মাও তখন উপদেশ ও উৎসাহ-ভরা কথাবার্তায় ছেলের হৃদয়ে মহৎ অভিলাষের মূল আরও দৃঢ় করতে যত্ন নিতেন। এই সময়ে ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদের সুনাম ও যশ চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। পিতার আদর্শ সব সময়ে বালক আশুতোষকে নিজ জীবনে বড় হওয়ার জন্য উৎসাহিত করত। বোধ হয়, এই কারণেই লেখাপড়ার জন্য তাঁকে একদিনও তাড়না করতে হয়নি। প্রকৃত বড় হওয়ার এই আন্তরিক ইচ্ছা ও বিদ্যার অনুরাগের জন্যই তিনি দেশের বিদ্যা ও শিক্ষা বিষয়ে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হতে পেরেছিলেন।

(আশুতোষের ছাত্র জীবন-অতুলচন্দ্র ঘটক/সম্পাদনা- উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়)

নব্য বাংলার শিক্ষাগুরু আশুতোষ

আধুনিক বাংলার শিক্ষাগুরু স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তাঁর প্রায় অর্ধশত বর্ষ ব্যাপী কর্মময় জীবন জনহিতার্থে সমর্পণ করেছিলেন এবং তাঁর জীবনকালে তিনি বাংলা তথা ভারতকে অনেক অমূল্য অবদান দিয়ে গেছেন। আধুনিক বাংলা ঐ বিশাল ব্যক্তিত্ব তথা বহুমুখী প্রতিভার স্মৃতি কখনো ভুলবে না। তাঁর সমসাময়িক বিদ্বজ্জনেরা তাঁকে মা সরস্বতীর বরপুত্র রূপে গণ্য করতেন এবং তাঁর প্রতি অত্যধিক শ্রদ্ধা পোষণ করতেন। বাস্তবিক, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের জ্ঞান, বিশেষতঃ শিক্ষা ও সংস্কৃতি সহ সামাজিক জীবনের সর্বক্ষেত্রে তাঁর অবদান ছিল অসামান্য। ভারতীয় ঐতিহ্য ও আদর্শ-পরম্পরা সম্বন্ধে তাঁর অসীম ভালবাসা ও জ্ঞান এতই গভীর ছিল যে ঐগুলিকে তিনি নিজ জীবনকালের মধ্যেই বাস্তবে রূপায়িত করেছিলেন। নিজের মধ্যে প্রাচ্য সংস্কৃতি এবং পাশ্চাত্য চিন্তাধারার শ্রেষ্ঠ গুণগুলির সম্মিলন ঘটিয়ে তিনি চেয়েছিলেন যে তাঁর ছাত্রদের ব্যক্তিগত ও সামগ্রিক জীবনের মধ্যে যেন ভারতের আধ্যাত্মিক তথা নৈতিক মূল্যবোধগুলির সহিত পাশ্চাত্যের বৈজ্ঞানিক ও বাস্তব-বোধের স্বাভাবিক ও আদর্শ মিলন প্রতিফলিত হয়, যাতে তারা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সমস্যাগুলিকে সম্যক উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়।

মহান পিতার মহান সন্তান

স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীমতী যোগমায়া দেবীর দ্বিতীয় পুত্র শ্যামাপ্রসাদের জন্ম ১৯০১ সালের ৬ই জুলাই কলকাতার ভবানীপুরে ৭৭নং আশুতোষ মুখার্জী রোডের বাসভবনে। পিতা, মাতা এবং পিতামহী জগত্তারিণী দেবী ও জ্যেষ্ঠা ভগিনী কমলার স্নেহ মমতায় তাঁর বাল্যকাল অতিবাহিত হয়।

কৃতিত্বপূর্ণ ছাত্র-জীবন

১৯০৬ সালে শ্যামাপ্রসাদ মিত্র ইন্সটিটিউশন স্কুলে (ভবানীপুর) ভর্ত্তি হন এবং ঐ স্কুল থেকে ১৯১৭ সালে সরকারী বৃত্তিসহ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯১৯ সালে প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে তিনি আই. এ. পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন, এবং ১৯২১ সালে বি. এ.-তে ইংরেজি অনার্সেও শীর্ষ স্থান লাভ করেন। আই. এ. এবং বি. এ. এই দুই পরীক্ষাতেই বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে প্রথম হয়ে তিনি বঙ্কিমচন্দ্র রৌপ্য ও স্বর্ণপদক লাভ করেন। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি ছিল তাঁর গভীর অনুরাগ। তার মাত্র তিন বছর আগে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় ভাষাগুলিতে এম. এ. পরীক্ষা গ্রহণের নিয়ম প্রবর্ত্তিত হয়েছে।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে স্যার আশুতোষের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলে সারাভারতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ই সর্বপ্রথম মাতৃভাষায় সর্বোচ্চ ডিগ্রী লাভের নিয়ম প্রবর্ত্তন করে। এই যুগান্তকারী বিধানকে স্বাগত না জানিয়ে শিক্ষিত সমাজের একাংশের বিরূপতায় বাংলা ভাষায় এম. এ পাশদের নিয়ে নানা রঙ্গব্যঙ্গ রচনা কার্টুন প্রকাশিত হতে থাকে পত্রপত্রিকায়। মাতৃভাষার গৌরবে গৌরবান্বিত না হ'য়ে এই সিদ্ধান্তকে হেয় করার মনোবৃত্তিতে স্যার আশুতোষ দুঃখিত হলেন, কিন্তু দমলেন না। বাংলা বিষয়ের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য তাঁর মধ্যম পুত্র, ইংরেজি সাহিত্যে বি. এ. অনার্সে সর্বোচ্চ স্থানাধিকারী শ্যামাপ্রসাদকে এম. এ. ক্লাসে বাংলায় ভর্ত্তি করে দিলেন। তিনি 'আপনি আচরি ধর্ম পরেরে শিখায়' নীতি পুরোপুরি মেনে চলতেন। শ্যামাপ্রসাদ ১৯২৩ সালে বাংলায় এম. এ. পরীক্ষা দিলেন এবং শীর্ষস্থান অধিকার করলেন। সেই পরীক্ষায় দুই পেপারের পরিবর্ত্তে তিনি যে থিসিস/ মৌলিক প্রবন্ধ রচনা করেন, তার বিষয়বস্তু ছিল গিরিশচন্দ্রের সামাজিক নাটকগুলি— 'The Social Plays of Girish Chandra'.

দ্বিতীয় অধ্যায়

বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনে

তাঁর ছাত্রাবস্থাতেই পিতা আশুতোষ তাঁর সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শ, বিধিবিধান, কার্যপদ্ধতি প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করতেন। তাঁর প্রতিভা যা'তে শুধু শিক্ষাক্ষেত্রেই নয়, সর্বতোমুখী হয়ে বিকশিত হয়, সেদিকে আশুতোষের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। বিশ্ববিদ্যালয় ও দেশের বৃহত্তর শিক্ষাক্ষেত্রে অটুট স্বাধীনতা ও অম্লান মর্যাদা সংরক্ষণের প্রেরণা তিনি পিতার নিকট থেকেই লাভ করেন।

এ সময় 'বঙ্গবাণী' পত্রিকার জন্য লেখা সংগ্রহে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা জন্মে তিনি যখন এম. এ. ক্লাসের ছাত্র, তখন তাঁর বিবাহ হয় কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর পুত্র বেণীমাধব চক্রবর্তীর কন্যা সুধাদেবীর সঙ্গে (১৬ই এপ্রিল, ১৯২২)।

বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় পদক্ষেপ

ছাত্রজীবন অতিবাহিত হবার পূর্বেই তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেবায় মনোযোগ দেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাসম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা দূরীকরণ-কল্পে পিতার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে থেকে কাজ করবার এবং বহু মূল্যবান উপদেশ গ্রহণের সৌভাগ্য তাঁর হয়েছিল। ১৯২৪ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে আনুষ্ঠানিকভাবে এম. এ., ডিগ্রি গ্রহণ করবার পূর্বেই তিনি সেনেট কর্তৃক পোষ্ট-গ্রাজুয়েট শিক্ষাকমিটির অন্যতম সদস্য এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো নির্বাচিত হন।

বিনা মেঘে বজ্রাঘাতঃ আশুতোষের অন্তর্ধান

কিন্তু পুত্রকে কর্মজগতে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার আগেই বিনা মেঘে বজ্রাঘাত। ১৯২৪ সালের ২৫ শে মে পাটনা শহরে অকস্মাৎ আশুতোষের জীবনদীপ নির্বাপিত হল। শ্যামাপ্রসাদ তখন ট্রেনে—সিমলা থেকে ছুটে আসছেন পিতৃদেবের অসুস্থতার সংবাদ পেয়ে; সঙ্গে ডাক্তার নীলরতন সরকার। পৌঁছে দেখেন—'বাবা শুয়ে আছেন। মাথার কাছে গীতা আর তুলসী গাছ। মাটিতে বসে প্রমথ আর বড়দা। সব শেষ।' শ্যামাপ্রসাদ লিখেছেন—'১৯২৪ সালের ২৫শে মে থেকে জীবনের গতি পরিবর্তন হয়ে গেল। এক রাত্রির মধ্যে সব চাপল্য খেলাধূলা যেন শেষ হ'য়ে গেল। নতুন জীবনের অধ্যায় আরম্ভ হল।'

পিতার শূন্য আসনে সিন্ডিকেটেঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের সেবায় কায়মন সমর্পণ

তখন শ্যামাপ্রসাদের বয়স মাত্র ২৩ বছর। এম. এ. ও ল' পাশ করেছেন। সবে আইন ব্যবসায়ে যোগদান করেছেন। এই সময় তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ফেলো' মনোনীত হন।

আশুতোষের মৃত্যু হলে তাঁর শূন্যস্থলে সিণ্ডিকেটের সদস্যও নির্বাচিত হন। এর দুবছর পরে ১৯২৬ সালে তাঁর বিলেত যাওয়া ও ব্যারিস্টারী পাশ করে আসা।

বিলাত থেকে ফিরে এসে শ্যামাপ্রসাদ আইন ব্যবসায়, বিশ্ববিদ্যালয়ে আংশিক সময়ের জন্য অধ্যাপনায় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে নিজেকে উৎসর্গ করেন। তাঁর কর্মনিষ্ঠা ও একাগ্রতা লক্ষ্য করে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র আশুতোষের মৃত্যুর এক বছর পার না হতে শ্যামাপ্রসাদকে লিখেছিলেন— 'Universityর সাধারণ কাজে তুমি দেখি 'বাপকা বেটা' হইয়াছ। কেননা এত অক্লান্ত পরিশ্রম ও স্বার্থত্যাগ কেহই করিতে রাজী নয়।'

বঙ্গীয় আইন সভায় প্রবেশ

১৯২৯ সালে শ্যামাপ্রসাদ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি হিসাবে এবং কংগ্রেস সদস্যরূপে বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে নির্বাচিত হন। রাজনীতির সঙ্গে এই তাঁর প্রত্যক্ষ যোগাযোগ। ১৯৩০ সালে কংগ্রেস কাউন্সিল বর্জনের সিদ্ধান্ত নিলে তিনি কাউন্সিল থেকে পদত্যাগ করেন এবং পুনরায় স্বতন্ত্র সদস্যরূপে নির্বাচিত হন।

পিতার আরব্ধ কার্যে পূর্ণাহুতি ঃ মাতৃভাষার মাধ্যমে ম্যাট্রিক পরীক্ষা বাংলা সাহিত্যের বিশেষ অধ্যাপক পদে রবীন্দ্রনাথ

বিশ্ববিদ্যালয় সেনেট/ সিণ্ডিকেটের সদস্যরূপে তাঁর প্রথম অক্ষয় কীর্তি পরলোকগত পিতার অসমাপ্ত কাজে পূর্ণতা দান—অর্থাৎ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার মাধ্যম হিসাবে মাতৃভাষার স্বীকৃতি। যেদিন এই সিদ্ধান্ত সেনেটে গৃহীত হয়, সেদিন সেনেটের অন্যতম প্রবীণ সদস্য তথা প্রাক্তন উপাচার্য স্যার দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী মাতৃভাষা সংক্রান্ত ও পোষ্ট-গ্র্যাজুয়েট রেগুলেশন-গুলি বিধিবদ্ধ করায় শ্যামাপ্রসাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ভূয়সী প্রশংসা করেন। স্যার দেবপ্রসাদের সুরে সুর মিলিয়ে ডাঃ উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী বলেন, পিতার প্রারব্ধ কর্ম সার্থক করে তোলায় পুত্র গর্বিত হতে পারেন; শ্যামাপ্রসাদ ছাড়া এ কাজ সম্ভব হ'ত না।

তিনিই রবীন্দ্রনাথকে বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে "বিশেষ" অধ্যাপক পদে নিয়োগে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন। রবীন্দ্রনাথকে "কমলা লেকচারার" রূপে বক্তৃতা দানের জন্যও আমন্ত্রণ জানান।

পারিবারিক বিপর্যয় ঃ পত্নী সুধাদেবীর অকাল মৃত্যু

'কিন্তু ভাগ্যবিধাতা যেন সংসার ক্ষেত্র থেকে তাঁকে বিচ্ছিন্ন ক'রে সর্বত্যাগীরূপে দেশের ও দশের কাছে আত্মনিয়োগের জন্যই তাঁর পারিবারিক জীবনে আবার অকস্মাৎ মৃত্যুবাণ হানেন। ১৯৩৩ সালে হঠাৎই তাঁর পত্নী বিয়োগ হয়।' উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সেই মর্মান্তিক ঘটনা উল্লেখ ক'রে লিখেছেন—'এখনও মনে আছে সেই রাত্রে শ্মশান-ঘাটে আমরা পাশাপাশি বসে,-চিতার উপর শায়িত সেই লক্ষ্মীপ্রতিম মরদেহ। সিঁথিভরা টকটকে লাল চওড়া সিঁদুর।

নয় বছরের পুত্র মুখাগ্নি করছে। দাউ দাউ ক'রে চিতা জ্বলে উঠেছে। প্রস্তরমূর্তির মত মেজদা নির্বাক নিস্পন্দ হ'য়ে ব'সে, নিষ্পলক চোখে সেদিকে চেয়ে। হঠাৎ কানে এল তাঁর অস্ফুট স্বগতোক্তি—কী সর্বনাশই না হয়ে গেল।' সর্বনাশ তো বটেই! চারটি নাবালক পুত্রকন্যা। আর কখনও দারপরিগ্রহ করেননি। নিজে বহির্জগতে কর্মজীবন নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। জ্যেষ্ঠভ্রাতা রমাপ্রসাদের স্ত্রী তারাদেবী মাতৃহীন বালক-বালিকাদের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদেঃ সর্বকনিষ্ঠ উপাচার্য
শিক্ষা সম্প্রসারণে ও উন্নয়নে ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত

পরের বছর ১৯৩৪ সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিযুক্ত হলেন। বয়স তখন তাঁর মাত্র ৩৩ বছর। পরপর দু'বার, অর্থাৎ ১৯৩৮ পর্যন্ত তিনি এই পদে আসীন থাকেন। উপাচার্য হিসাবে তাঁর কার্যকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজকর্মের অনুপুঙ্খ বিবরণ দেবার অবকাশ এখানে নেই। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা দিবস সাড়ম্বরে উদযাপন, বাংলা বানান সংস্কার, বাংলা পরিভাষা সমিতি গঠন, রবীন্দ্রনাথকে বাংলায় সমাবর্ত্তন ভাষণ দানে আহ্বান, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতীক চিহ্ন পরিবর্ত্তন ইত্যাদি ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক তাৎপর্যপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলির কথা আজ হয়ত অনেকেরই জানা নেই। শিক্ষা সম্পর্কে তাঁর চিন্তাধারা প্রকাশ পেয়েছে কলকাতা, বোম্বাই, পাটনা, বেনারস ইত্যাদি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত সমাবর্ত্তন ভাষণগুলিতে। দেশের প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয়ের কনিষ্ঠতম উপাচার্যপদে অধিষ্ঠিত হ'য়ে প্রতিকূল সরকার ও বিরোধীপক্ষের চাপের মাঝেও বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়ে, তরঙ্গসঙ্কুল তটিনীর বুকে তরণী চালাবার ম'ত যে ভাবে তিনি দক্ষ হাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের হাল ধরেছিলেন তাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবীন কর্মকর্ত্তারাও বিস্মিত হয়েছিলেন।

তাঁর চার বর্ষব্যাপী উপাচার্যকালে যে সমস্ত সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা গৃহীত ও রূপায়িত হয়, তন্মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলঃ

ক) মাতৃভাষার মাধ্যমে ম্যাট্রিকুলেশন স্তরে পঠন-পাঠন ও পরীক্ষা দেবার ব্যবস্থা।

খ) সুসংবদ্ধ বাংলা বানান পদ্ধতি নির্ধারণ।

গ) বৈজ্ঞানিক শব্দের পরিভাষা রচনা ও সংকলন।

ঘ) প্রাচীন সভ্যতা সংস্কৃতির নিদর্শন সংরক্ষণ, চর্চা ও গবেষণার জন্যে আশুতোষ মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠা।

ঙ) ভি. এল. মিত্র ফান্ডের শর্তানুসারে মহিলাদের জন্য গার্হ্যস্থ বিজ্ঞান পাঠক্রমের সূচনা

চ) ছাত্রদের Social Welfare সম্পর্কে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা; পরে তার সঙ্গে যুক্ত হয় Business Management পাঠক্রম।

ছ) ছাত্রদের কর্মসংস্থান সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করতে Information and Employment Board স্থাপন।

জ) শিক্ষকদের শিক্ষাদানে দক্ষ করে তুলতে Teachers Training Course-এর প্রবর্তন।

ঝ) ছাত্রদের সামরিক শিক্ষাগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করতে C.U Training Course-এর প্রবর্তন ও Military Studies-এর ব্যবস্থা।

ঞ) ছাত্রদের স্বাস্থ্যের প্রতি নজর রাখার জন্য Students' Welfare Board স্থাপন।

ট) জ্ঞানবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা সম্পর্কে সাধারণ পাঠকের জ্ঞাতার্থে বাংলায় ছোট ছোট পুস্তিকা প্রকাশ।

ঠ) গ্রন্থাগার ও পাঠাগারের জন্য বিস্তৃত জায়গার ব্যবস্থা। আশুতোষ বিল্ডিং-এর উপর নতুন একতলা নির্মাণ। গ্রন্থাগারের চার দেয়াল ফ্রেস্কো দ্বারা সজ্জিতকরণ। তাতে ভারতীয় সংস্কৃতির ক্রমবিকাশ এবং সেক্ষেত্রে বাংলার অবদানের কথা বিশেষভাবে চিত্রিত।

ড) ছাত্রদের খেলাধুলা ও ব্যায়াম চর্চার ব্যবস্থা। ঢাকুরিয়া লেক-এ University Rowing Club স্থাপন। University Athletic Club প্রতিষ্ঠা।

ঢ) ময়দানে বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য আলাদা খেলার মাঠের ব্যবস্থা।

ণ) ফলিত পদার্থ বিদ্যায় 'Communication Engineering' পাঠক্রম চালু করা।

ত) চৈনিক ও তিব্বতীয় ভাষা চর্চার ব্যবস্থা।

থ) কলেজে I.Sc; Course চালু করা।

দ) ম্যাট্রিকুলেশন থেকে এম. এ. পর্যন্ত ভূগোল পড়াবার ব্যবস্থা

ধ) কৃষিবিদ্যা অধ্যয়নের ব্যবস্থা।

ন) ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় বয়সের বাধা প্রত্যাহার।

প) মুসলিম ইতিহাস ও সংস্কৃতি চর্চার উদ্দেশ্যে Islamic History & Culture বিভাগের পরিকল্পনা।

ফ) রবীন্দ্রনাথকে বাংলায় সমাবর্তন ভাষণদানে আহ্বান।

ব) বাংলা ভাষায় পি. এইচ. ডি. গবেষণা পত্র দাখিলের অনুমতি প্রদান।

ভ) যথাযোগ্য মর্যাদা ও জাঁকজমক সহকারে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্‌যাপন।

ম) ভারতীয় কৃষ্টি সংস্কৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতীক চিহ্নে পরিবর্তন, ইত্যাদি ইত্যাদি।

তৃতীয় অধ্যায়

বাংলার রাজনীতিতে দুর্যোগের কালো মেঘ
শিক্ষাক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতার অনুপ্রবেশ

ইতিমধ্যে বাংলার রাজনৈতিক আকাশের ঈশান কোণে দুর্যোগের কালো মেঘ ঘনিয়ে এসেছে। দুষ্টমতি বৃটিশ সরকার সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা নীতি এবং ধর্মভিত্তিক পৃথক নির্বাচন প্রচলন ক'রে হিন্দু-মুসলমান বিভাজনের প্রথম পর্ব সমাপ্ত করেছে। তৃতীয় গোলটেবিল বৈঠকের ফলশ্রুতি হিসাবে 'র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড সূত্র' অনুসারে হিন্দু সমাজকেও দুই ভাগ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের উন্নত ও অনুন্নত শ্রেণিতে বিভক্ত ক'রে অনুন্নতদের আলাদা ক'রে দেওয়ার চক্রান্ত রোধ করতে গান্ধিজী অনশন করলেন। তাঁর প্রাণ বাঁচাতে বাংলার বর্ণহিন্দুদের স্বার্থহানি ক'রে তফশিলীদের প্রতিনিধি সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়। পরে তাদের একাংশ মুসলিম লীগের সঙ্গে সামিল হ'য়ে বৃহত্তর সমাজকে রাজনৈতিক দিক থেকে পঙ্গু ক'রে তোলে।

কংগ্রেসের অদূরদর্শিতায় মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার পালে হাওয়াঃ

এই প্রেক্ষাপটে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অনুযায়ী ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে শ্যামাপ্রসাদ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্র থেকে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচিত হন। তার অব্যবহিত পূর্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতীক চিহ্নে 'শ্রী ও পদ্ম' এবং 'বন্দেমাতরম' সঙ্গীতের ভাষায় অনৈসলামিক ভাব খুঁজে নিয়ে মুসলিম রাজনীতিকরা বাংলার রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্পের ধোঁয়া ছাড়তে আরম্ভ করেছেন। এই সময়ে নির্বাচনের ফলাফল অনুসারে কংগ্রেস ও ফজলুল হকের কৃষক-প্রজা পার্টির মন্ত্রীসভা গঠন ক'রে সাম্প্রদায়িকতাকে জনজীবন থেকে দূরে ঠেকিয়ে রাখার এক সুবর্ণ সুযোগ এসেছিল। কিন্তু কংগ্রেসের সর্বভারতীয় অদূরদর্শী নেতৃত্ব সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে দিল না। বাংলার বৃহত্তর হিন্দুসমাজ রাজনীতির মূল স্রোত থেকে দূরে সরে গেল। সেই ফাঁকে সাম্প্রদায়িক মুসলিম লীগ রাজনীতির মূলমঞ্চ দখল করে বসল। এমন কি অসাম্প্রদায়িক মুসলিম জনপ্রতিনিধিরাও অনিচ্ছা সত্ত্বে মুসলিম লীগের করতলগত হলেন।

এই পরিস্থিতি বিশ্লেষণ ক'রে শ্যামাপ্রসাদ লেখেন যে, বাংলায় কংগ্রেস হিন্দুদের সব ভোটই পেয়েছিল। ফজলুল হকের কৃষক-প্রজা পাটি মুসলমানদের মধ্যে ভাল রকম সমর্থন পায়। হক পটুয়াখালিতে নির্বাচনে নাজিমুদ্দীনকে পরাজিত করেন। এই সময়ে যদি বাংলায় সংযুক্ত মন্ত্রীসভা গঠন করা যেতো, তবে লীগ-বৃটিশ ষড়যন্ত্র অনায়াসে পরাজিত হ'ত। হিন্দু ও মুসলিম সদস্যদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বাংলা একটি শক্তিশালী প্রদেশে পরিণত হতে পারতো। কিন্তু কংগ্রেসের ওপরমহল তা হ'তে দিল না।

কংগ্রেসের এই অদূরদর্শী সিদ্ধান্তের পরিণতি যা হওয়ার তাই হ'ল। প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসনের প্রথম পরীক্ষাতেই বাংলায় মুসলিম লীগের শাসন স্থাপিত হ'ল। যদিও বাংলার

শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, শিল্প-বাণিজ্য, অর্থনীতি, ইত্যাদি জনজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তখন হিন্দুরা অগ্রবর্তী ভূমিকায়, কিন্তু প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থায় তাঁদের কোন কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ সম্ভব ছিল না; বিধান সভায় আলঙ্কারিক ভাষায় গরম গরম বক্তৃতা দেওয়া ছাড়া। ইতিমধ্যে যোগ্যাযোগ্য বিচার না ক'রে সরকারী চাকুরীতে সাম্প্রদায়িক হারে নিয়োগের ব্যবস্থা প্রচলন হয়েছে।

মুসলিম লীগ শাসনের স্বরূপ ঃ হিন্দু শিক্ষা ও স্বাধিকারের উপর আঘাত কংগ্রেসের নীরবতা

ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল বিল মারফৎ অন্যায্যভাবে হিন্দুদের প্রতিনিধিত্ব হ্রাস করা হয়। সেকেণ্ডারী এডুকেশন বিলের মাধ্যমে মাধ্যমিক শিক্ষাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক্তিয়ার থেকে সরিয়ে সেকেণ্ডারী বোর্ডের উপর মুসলিম লীগের কর্ত্তৃত্ব স্থাপনের আপ্রাণ প্রচেষ্টা চলে; যদিও বৃহত্তর শিক্ষাক্ষেত্রে মুসলিম অবদান ও প্রতিনিধিত্ব তখন শতকরা পাঁচ ভাগও নয়।

মুসলিম লীগ সরকারের পক্ষপাতদুষ্ট সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার ম'তো সাংগঠনিক দৃঢ়তা কংগ্রেসের মধ্যে দেখা যায়নি। শ্যামাপ্রসাদ তখনও পর্যন্ত প্রত্যক্ষভাবে কোন দলীয় রাজনীতিতে যুক্ত ছিলেন না। শিক্ষাক্ষেত্রকেই তিনি তাঁর বিচরণক্ষেত্র হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন। মুসলিম লীগের আধিপত্যে হিন্দুস্বার্থ ক্ষুণ্ণ হ'চ্ছে দেখে তিনি কংগ্রেস নেতাদের দ্বারস্থ হলেন এই অনুরোধ নিয়ে যে, তাঁরা যেন সক্রিয়ভাবে হিন্দুস্বার্থবিরোধী সরকারী নীতির প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ করেন। যদিও কংগ্রেস সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা অনুযায়ী হিন্দু ভোটেই নির্বাচন জিতেছিল, তবু পাছে কেউ ঐ দলকে সাম্প্রদায়িক আখ্যা দেয় এই ভয়ে সংখ্যালঘু হিন্দুদের স্বার্থরক্ষা নিয়ে আন্দোলন করা নেতাদের দ্বারা সম্ভব হল না। এই সময়ের পরিস্থিতির জটিলতা বিশ্লেষণ ক'রে শ্যামাপ্রসাদ লিখেছেন যে, তখনও পর্যন্ত তাঁর যে দলের প্রতি সমর্থন ছিল সে হ'ল কংগ্রেস। কিন্তু কংগ্রেস দুর্ভাগ্যজনকভাবে হিন্দুদের স্বার্থ সংরক্ষণে ব্যর্থ হয়। কংগ্রেসের রাজনৈতিক ব্যর্থতার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ ক'রে মুসলিম লীগ প্রশাসন কেমন ক'রে বাংলার হিন্দুদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত ক'রে তুলছিল, তা তিনি ডায়েরীতে লিপিবদ্ধ করেন। কিন্তু এতৎ সত্ত্বে ও কংগ্রেসী নেতারা তাঁদের সিদ্ধান্তহীনতার নীতিতে অটল অবিচল থাকেন। শ্যামাপ্রসাদের আবেদনে কোন সাড়া মেলেনি।

বসু ভ্রাতৃদ্বয়-শরৎ ও সুভাষ বসু ঃ মুসলিম তোষণে কেউ কম যাননি

যখন Calcutta Municipal Bill এবং Secondary Education Bill- এর মত 'কালাকানুন' পাশ করানোর উদ্যোগ চলল, তখন শ্যামাপ্রসাদ বাধ্য হয়ে তাঁর শিক্ষাজগতের নির্বাসন থেকে রাজনীতিতে সক্রিয় অংশ নিতে তৈরী হলেন। যখন এমন কি শিক্ষাব্যবস্থাকেও সাম্প্রদায়িকতার শিকার হতে হল, তখন তিনি তার বিরুদ্ধে জনমত জাগানোকে নিজের অবশ্য কর্ত্তব্য বিবেচনা করলেন। প্রথমেই তিনি শরৎচন্দ্র ও সুভাষচন্দ্র বসু ভ্রাতৃদ্বয়ের নিকট

গিয়ে সংখ্যালঘু হিন্দুদের অবিচার ও অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচাবার অনুরোধ করলেন। এর পিছনে কোন সাম্প্রদায়িক পক্ষপাতিত্বের উদ্দেশ্য ছিল না। কিন্তু বাংলার কংগ্রেস তখন দ্বিধাবিভক্ত। সুভাষচন্দ্র ইতিমধ্যে ফরওয়ার্ড ব্লক প্রতিষ্ঠা করে গান্ধিজীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আরম্ভ ক'রে দিয়েছেন। বাংলার অফিসিয়াল কংগ্রেস অত্যন্ত দুর্বল একটি গোষ্ঠী; দু'পক্ষের কেউই খোলাখুলি হিন্দুদের রক্ষা করতে অগ্রসর হলেন না। উপরন্তু কলকাতা কর্পোরেশনের শাসনভার সুভাষচন্দ্র মুসলিম লীগের মেয়রের হস্তে সমর্পণ করলেন। ঐ সময়ে অর্থাৎ ১৯৩৮ এর পরে ২৫০ জন সদস্যের বিধানসভায় কংগ্রেস ৮০ টি হিন্দু আসনের অধিকাংশই নিয়ন্ত্রিত করত। তিনি লক্ষ্য করলেন কেমন করে কংগ্রেস নেতৃত্বের রাজনৈতিক দেউলিয়া দৃষ্টিভঙ্গীর ফলে তাদের সমস্ত মুসলিম সদস্যরা মুসলিম লীগের কবলে চলে যাচ্ছে এবং মুসলিম লীগের আপোষ বিরোধী মনোভাবের ক্রমাগত তোষামোদ করার ফলে শুধু যে বাংলার সামাজিক, শিক্ষাগত ও সাংস্কৃতিক জীবনই বিপন্ন হয়ে পড়ছে তাই নয়, বরং মাতৃভূমির স্বাভিমানযুক্ত সন্তানরূপে হিন্দুদের অস্তিত্বই সঙ্কটাপন্ন হয়ে পড়েছে।

শ্যামাপ্রসাদের জীবনে সন্ধিক্ষণ ঃ শিক্ষাপ্রাঙ্গণ ছেড়ে রাজনীতির মঞ্চে

১৯৩৯ সালে এল তাঁর জীবনের এক সন্ধিক্ষণ, যখন ব্রিটিশদের পরোক্ষ সমর্থনে মুসলিম লীগ চট্টগ্রাম, মুন্‌শিগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, পাবনা ও ঢাকায় বিরাট আকারে দাঙ্গা ঘটায় এবং হিন্দু মহিলাদের উপর ভয়ঙ্কর পাশবিক অত্যাচার শুরু করে। ঐ সব স্থানেই হিন্দুদের বিরুদ্ধে অতি বর্বর নিষ্ঠুরতা চলল। বাংলার হিন্দুদের উপর মুসলমানদের ঐ নৃশংস আচরণের জন্য ব্রিটিশ প্রভুরা তাদের পুরস্কৃত করল। এই হিন্দুরাই ভারতের স্বাধীনতার জন্য জাতীয় আন্দোলনে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে, সেই কারণে ব্রিটিশরা তাদের একটু শিক্ষা দিতে চেয়েছিল। তাই হিন্দু নিধনকারী মুসলমানদের সরকারী চাকুরীতে নিয়োগ করে এবং স্থানীয় সংস্থাগুলিতে তাদের মনোনীত করে। তাদের জন্য শিক্ষাক্ষেত্রে বৃত্তি মঞ্জুর করে ব্রিটিশ সরকার মুসলমানদের প্রতি বিশেষ আনুকূল্য প্রদর্শন করে।

অপর দিকে মুসলমানদের অসন্তুষ্ট করার ভয়ে কংগ্রেস হিন্দু মন্দির ধ্বংসকারী, দাঙ্গাকারী ও নারীদের উপর পাশবিক অত্যাচারকারীদের নিন্দা করা থেকে সযত্নে বিরত থাকল। একইভাবে, সরকারী চাকুরীর ক্ষেত্রে হিন্দুদের বঞ্চিত করা এবং তাদের অন্যান্য নায্য অধিকার খর্ব করার ব্যাপারেও কংগ্রেস আপত্তি করার সাহস করেনি। এমনি করে, হিন্দুদের দেশপ্রেম তথা জাতীয় স্বার্থে কাজ করার পরিবর্তে তথাকথিত জাতীয়তাবাদী কংগ্রেস হিন্দুদের উপর নির্যাতন ও অন্যায় অবিচার মুখ বুজে মেনে নিল—শুধু মুসলিম লীগের নেতাদের অসন্তোষের ভয়ে।

বীর সাভারকরের সংস্পর্শে ঃ হিন্দু মহাসভার সভাপতি পদে

১৯৩৯ সালে নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভার কলকাতা অধিবেশনে শ্যামাপ্রসাদ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন। ১৯৪০ সালে নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভার কার্যকরী সভাপতি নির্বাচিত হন এবং ১৯৪০-৪৪ বঙ্গীয় হিন্দু মহাসভার সভাপতি পদে বৃত হন।

কিন্তু তিনি এমন মানুষ ছিলেন না যিনি নিশ্চেষ্ট হয়ে, জাতীয় স্বার্থের পক্ষে যাকে তিনি প্রকৃতই ক্ষতিকর বলে উপলব্ধি করেছিলেন, তার বিষয়ে চুপ করে বসে থাকবেন। উত্তরাধিকার সূত্রে তিনি যে নির্ভীকতা ও কর্তব্যনিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন, সেটাই তাঁকে প্রেরণা জোগাল এবং তিনি প্রকাশ্যেই কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের বিরোধিতা করার সংকল্প গ্রহণ করলেন।

শ্যামাপ্রসাদের রাজনৈতিক জীবনের এই সন্ধিক্ষণে দুইজন মানুষ তাঁকে বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করেন এবং তাঁকে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য করেন। তাঁরা হলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের প্রতিষ্ঠাতা (**স্বর্গত ডাঃ কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার এবং স্বাতন্ত্র্যবীর সাভারকর।**) বীর সাভারকর ঠিক সেই সময়েই রত্নগিরি জেলায় তাঁর নিজ গৃহে অন্তরীণ থেকে মুক্তিলাভ করেছিলেন। তাঁরা দুজনেই ছিলেন বিরাট দেশপ্রেমিক এবং দেশের জন্য চরম স্বার্থত্যাগ করেছিলেন। তাঁরা জাতীয় সমস্যাগুলির ব্যাপারে কংগ্রেসের চরম দেউলিয়া নীতিগুলিকে প্রকাশ্যে উদ্‌ঘাটিত করার অসম সাহস দেখিয়ে ছিলেন এবং দেশের সামনে হিন্দুত্ব তথা হিন্দুরাষ্ট্রের ধারণার উপর আধারিত রাষ্ট্রীয় ঐক্যের এক কার্যসূচী তুলে ধরেছিলেন। হিন্দুত্বের ধারণা দেশের প্রতি ভালবাসা এবং তার প্রাচীন সংস্কৃতির উপরে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করে। এটাই দেশাত্মবোধ তথা রাষ্ট্রীয় চেতনার প্রধান প্রেরণা হতে পারে, শুধুমাত্র ব্রিটিশ বিরোধিতায় কখনো তা হতে পারে না। এই দৃষ্টিভঙ্গী ডঃ মুখার্জীর অন্তর্নিহিত মানসিকতায় সাড়া জাগল। অতএব তিনি হিন্দু মহাসভার কাজে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে শুরু করলেন। ঐ সময়ে হিন্দু মহাসভার পুনর্বিন্যাস চলছিল। তিনি ১৯৩৯ সালে বীর সাভারকরের সভাপতিত্বে কলকাতায় অনুষ্ঠিত হিন্দু মহাসভার বার্ষিক অধিবেশনে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেন এবং পরের বছর বীর সাভারকর ক্রমাগত অসুস্থ থাকায় মহাসভার কার্যকরী সভাপতি পদে মনোনীত হন।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রাণপুরুষ স্বামী প্রণবানন্দজীর স্নেহধন্য শ্যামাপ্রসাদ ঃ বাঙালী হিন্দুর নেতৃত্বে অভিষিক্ত

১৯৪০ খৃষ্টাব্দে জন্মাষ্টমী উপলক্ষ্যে সঙ্ঘের পক্ষ থেকে এক বিরাট হিন্দুসম্মেলনের আয়োজন করা হয়। স্যার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় উহার উদ্বোধন করেন এবং শ্যামাপ্রসাদ সভাপতিত্ব করেন। সম্মেলনের পাঁচদিন পূর্বে সঙ্ঘনেতা আচার্য্যদেব বললেন—"শ্যামাপ্রসাদকে নিয়ে এসো, বিশেষ কথা আছে।" সন্ন্যাসীরা শ্যামাপ্রসাদবাবুকে আনতে গেলেন। তিনি সন্ধ্যা ৭টার সময় আসবেন বললেন। এদিকে আচার্য্যদেব প্রস্তুত হয়ে বসে আছেন; সন্ন্যাসীরা আশ্রমের সম্মুখস্থ রাস্তায় অভ্যর্থনার জন্য দাঁড়িয়ে রইলো। কার্যে অতিমাত্র ব্যস্ততাবশতঃ শ্যামাপ্রসাদ আসতে পারলেন না। পরদিন আবার গেলে তিনি আবার সময় দিলেন; কিন্তু সেদিনও আসতে পারলেন না। সঙ্ঘনেতা আচার্য্যদেব পর পর চারদিন তাঁকে আনবার জন্য লোক পাঠালেন। চারদিনই সময় দিয়েও তিনি আসতে পারেননি। শেষ দিন শ্যামাপ্রসাদ বলে দিলেন—"দেখুন,

আমি প্রত্যেক দিন কথা দিয়েও কথা রাখতে পারছিনা, এজন্য বিশেষ লজ্জিত। স্বামীজী মহারাজকে বলবেন যে সম্মেলনের দিন ছাড়া আমার যাবার সময় হবে না। তিনি যেন ক্ষমা করেন।"

সম্মেলনের দিন সঙ্ঘনেতা আচার্য্যদেব মোটরে গিয়ে সম্মেলনের মণ্ডপের সম্মুখে, রাস্তায় অপেক্ষা করতে লাগলেন। শ্যামাপ্রসাদের মোটর এলো। তাঁকে সঙ্গে নিয়ে আচার্য্যদেব সভামণ্ডপে প্রবেশ করলেন। মঞ্চের উপর উঠে আচার্য্যদেব স্বহস্তে স্বীয় কণ্ঠ হতে পুষ্পমাল্য উঠিয়ে শ্যামাপ্রসাদের গলায় দিলেন। তারপর যথারীতি সম্মেলনের কাজ শুরু হয়ে গেলো।

সম্মেলনের পরে আশ্রমে প্রত্যাবর্তনের পর যখন আচার্য্যদেবের গায়ের জামাটা খুলে দিচ্ছেন, তখন তিনি অর্ধ্বস্বগতভাবে বললেন—"বাঙালী হিন্দুর সামনে দাঁড়াবার লোক ঠিক করে দিয়ে গেলাম।" একথার মধ্যে যে সঙ্ঘনেতা আচার্য্যদেবের আসন্ন মহাপ্রয়াণের ইঙ্গিত ছিল তা' তখন বুঝিনি। মনে ভাবলুম—"শ্যামাপ্রসাদকে তিনি অত্যন্ত স্নেহ করেন; শ্যামাপ্রসাদ হিন্দুর জন্য সংগ্রাম করছেন; তাই তাঁকে জয়ের আশীর্বাদ দিলেন।"

সেইবারই অক্টোবর মাসে দুর্গাপুজোর সময় কাশীধামে আচার্য্যদেব একদিন বললেন—"শ্যামাপ্রসাদকে নিয়ে এসো।" আচার্য্যদেব দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন—"হ্যাঁ। খোঁজ করে নিয়ে এসো।" খোঁজ খবর নিয়ে জানা গেল সপরিবারবর্গে শ্যামাপ্রসাদ "হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে" আছেন। আচার্য্যদেবের কথা তাঁকে বলা হলো। তিনি বললেন—"মহাষ্টমীর দিনে সকালে আমরা সবাই আশ্রমে গিয়ে দেবীকে দর্শন ও তাঁকে দর্শন করবো।" শ্যামাপ্রসাদ সপরিবারবর্গে গঙ্গা-স্নানান্তে প্রাতে ৮টার সময়ে আশ্রমে এলেন। শ্যামাপ্রসাদের সহিত আচার্য্যদেবের কী যে আলাপ আলোচনা হয়েছিল, তা' কেউ জানে না।

এই সমস্ত ঘটনার উল্লেখ করার অর্থ এই যে, এ যাবৎ ভারতে যত নেতার আবির্ভাব তিরোভাব ঘটেছে, তাদের মধ্যে কাহাকেও কর্মক্ষেত্রে এমনতর যথেষ্টভাবে কোনো মহাপুরুষের স্নেহ ও কৃপাভাজন হতে দেখা যায়নি। মহাপুরুষের এই আশীর্বাদ শ্যামাপ্রসাদের জীবনকে আদর্শের পথে, হিন্দুত্বের আদর্শ ও ভারতীয়ত্বের আদর্শ পথে—অটুট রেখেছিল—একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। এ বিষয়ে ভারতের ছোট বড় কোনো নেতার সহিতই শ্যামাপ্রসাদের তুলনা হয় না।" (স্বামী বেদানন্দ)

চতুর্থ অধ্যায়

পাকিস্তান প্রস্তাবঃ কমিউনিস্টদের সমর্থন হিন্দু মহাসভার বিরোধিতা

১৯৪০ সালে ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে দু'টো সুদূরপ্রসারী ঘটনা ঘটে। ওই বছর ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় চার বছরের জন্য অখিল ভারতীয় হিন্দু মহাসভার কার্যকরী সভাপতি নির্বাচিত হলেন। আর ঐ বছরই লাহোর সম্মেলনে মুসলিম লীগের কুখ্যাত 'পাকিস্তান প্রস্তাব' পাশ হয়ে গেল।

পাকিস্তান প্রস্তাব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মুসলিম লীগ সভাপতি মহম্মদ আলি জিন্না দাবি করলেন, "ভারতের সমস্যা সম্প্রদায়গত নয়, বরং জাতিগত। এটা খুবই দুঃখের যে হিন্দু বন্ধুরা ইসলাম এবং হিন্দুত্বের স্বরূপ ঠিক বুঝতে পারছেন না। ইসলাম এবং হিন্দুত্ব শুধু আলাদা ধর্ম নয়, সম্পূর্ণ বিপরীত দুই জাতিসত্ত্বা। মুসলমানরা সংখ্যালঘু নয়। আলাদা একটা জাতি। জাতি গঠনের সমস্ত উপাদান তাদের আছে। তাই তাদের অবশ্যই নিজেদের বাসভূমির অধিকার আছে।"

কমিউনিস্টরা মহা উৎসাহে জিন্নার বক্তব্যকে সমর্থন করল। তারা বলল, মুসলমানদের জন্য আলাদা রাষ্ট্রের ব্যবস্থা করা উচিত। পার্টি থেকে দাবি করা হল, "The Pakistan is a just, progressive and national demand".

১৯৪০ সালেই মুসলিম লীগের লাহোর প্রস্তাবের বিরুদ্ধে সোচ্চার আন্দোলন শুরু করলেন ডঃ শ্যামাপ্রসাদ। লীগের দেশভাগের প্রস্তাবের বিরোধিতা করতে রাস্তায় নামিয়ে এনেছিলেন সংগঠনকে। হিন্দুমহাসভার তরফ থেকে Anti-Communal Award Day পালন করা হয় সারা দেশে। ঢাকার কর্পোরেশন ময়দানে এক বিশাল জনসভায় শ্যামাপ্রসাদ দেশবাসীকে ডাক দিয়েছিলেন ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য—মুসলিম লীগের সাম্প্রদায়িক রাজনীতি এবং কংগ্রেসের আত্মমর্যাদাহীন আত্মসমর্পণ নীতির বিরুদ্ধে।

১৯৪২ সালে হিন্দুমহাসভার লক্ষ্ণৌ অধিবেশনে শ্যামাপ্রসাদ ঘোষণা করলেন যে, মুসলমানদের খুশি করার জন্য কংগ্রেস দেশবিরোধী (anti-national) যে কার্যকলাপে লিপ্ত হয়েছে হিন্দুমহাসভা শেষ রক্তবিন্দু দিয়েও তা রুখবে। অমৃতসরে হিন্দুমহাসভার সর্বভারতীয় সম্মেলনে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তাঁর ভাষণে পরিষ্কার বলেছিলেন যে পাকিস্তান দাবির উপর ভিত্তি করে মুসলীম লীগের সঙ্গে কোন আলোচনা হতে পারেনা।"

হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলিত মন্ত্রীসভায় শ্যামাপ্রসাদঃ শ্যামা-হক মন্ত্রীসভা

১৯৪১ সালে বাংলায় এক নতুন পরিস্থিতির সৃষ্টি হল। ফজলুল হকের সঙ্গে মহম্মদ আলি জিন্নার তুমুল বিবাদ শুরু হল। জিন্নার উদ্ধত ও স্বেচ্ছাচারী ব্যবহারে তাঁর সহকর্মীরা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে উঠছিলেন এবং ঐ নেতার আধিপত্য থেকে মুক্ত হয়ে যাঁদের নিজেদের

স্বতন্ত্র অনুগামী দল ছিল, তাঁরা ফজলুল হকের নেতৃত্বে মুসলিম লীগের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করলেন। ফজলুল হক তারপর বিধানসভার হিন্দু সদস্যদের সমর্থন নিয়ে শাসন-ক্ষমতা বজায় রাখবার জন্য তাঁদের সহযোগিতা লাভের আবেদন জানালেন। পরিস্থিতির গুরুত্ব ডঃ মুখার্জী খুব তাড়াতাড়ি উপলব্ধি করলেন। তিনি বুঝতে পারলেন যে জাতীয়তাবাদী শক্তিগুলির কাছ থেকে সাড়া পেতে ব্যর্থ হলে তিনি আবার মুসলিম লীগের শিবিরে চলে যেতে বাধ্য হবেন। সেই কথা বিবেচনা করে ডঃ মুখার্জী ফজলুল হক সহ প্রোগ্রেসিভ কোয়ালিশন (Progressive Coalition) গঠন করলেন এবং অর্থমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করে মন্ত্রিসভায় যোগ দিলেন। ১৯৪১ সালের ১১ই ডিসেম্বর হইতে ১৯৪২ সালের ২০শে নভেম্বর পর্যন্ত তিনি মন্ত্রীপদে আসীন ছিলেন। বিহার গভর্ণমেন্ট কর্তৃক হিন্দুমহাসভার ভাগলপুরের অধিবেশনের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হলে সভাপতিরূপে ডঃ মুখার্জীর নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে ভাগলপুর যাত্রা, ভারতীয় দেশরক্ষা আইন অনুসারে কারাবরণ ও পরে মুক্তিলাভ করেন।

ক্রিপ্‌স্‌ মিশন আলোচনায় অংশগ্রহণ

"বৃটিশ সরকার ভারতে যে রাজনৈতিক ঐক্য সাধন করেছে, বিদায়কালে তা-ই ভেঙে দেবার পরিকল্পনা করেছে"— ক্রিপসের কাছে অনুযোগ।

১৯৪০ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত ডঃ মুখার্জীর জীবন কাহিনী বস্তুতঃ জাতীয়তাবাদী ভারতেরই কাহিনী, যে সময়ে কংগ্রেসের ভ্রান্ত রাজনীতির ফলে দেশ বিভাজনের মারাত্মক ঘটনা ঘটল এবং তার পরিণামে এল ভীষণ দুঃখ-দুর্দশা ও নানা ভয়ঙ্কর সমস্যা। এই সময়ে তিনি জাতীয়তাবাদী ভারতের মানসিকতার সঠিক স্বরূপটি কংগ্রেস নেতাদের ও ব্রিটিশ শাসকদের সামনে অনমনীয় যুক্তি ও দৃঢ়তার সঙ্গে তুলে ধরেন। তিনি বাংলা তথা ভারতের নিপীড়িত মানুষদের সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করে তোলেন এবং একাগ্র নিষ্ঠা ও নির্ভীক সংকল্প সহকারে সেই মানুষদের সেবায় আত্মসমর্পণ করেন।

১৯৪২ সালে আগস্ট আন্দোলনের সময় মেদিনীপুরে ও অন্যত্র গভর্ণর কর্তৃক অনুসৃত দমননীতির প্রতিবাদে বাংলার মন্ত্রিসভা হইতে পদত্যাগ। ইঙ্গ ভারতীয় সমস্যা সমাধানকল্পে কতকগুলি প্রস্তাব লইয়া তদানীন্তন ভাইসরয় লর্ড লিনলিথগোকে পত্রদান। কারারুদ্ধ মহাত্মাজীর সহিত সাক্ষাতের চেষ্টায় ব্যর্থ।

পঞ্চম অধ্যায়

শ্যামাপ্রসাদ ও মেদিনীপুর ঃ বৃটিশ রাজপুরুষদের সঙ্গে সরাসরি সংঘাত

১৯৪২ সালের আগস্ট মাসে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস বম্বে অধিবেশনে 'ভারত ছাড়' প্রস্তাব গ্রহণ করে, কিন্তু কোন কার্যক্রম ঘোষণার পূর্বেই বৃটিশ সরকার নেতৃবৃন্দকে গ্রেপ্তার ক'রে বিভিন্ন জেলে পাঠায়। নেতৃত্বহীন জনগণ বিক্ষিপ্ত আন্দোলন আরম্ভ করে। বাংলায় 'ভারত ছাড়' আন্দোলনে ব্যাপকভাবে সাড়া দেয় মেদিনীপুর জেলার কাঁথি ও তমলুক মহকুমার জনসাধারণ। সেখানে বৃটিশ শাসনের উচ্ছেদ ঘটিয়ে সমান্তরাল জাতীয় সরকার স্থাপিত হয়। মেদিনীপুর জেলার অধিবাসীদের উপর বৃটিশ-রাজ ইতিপূর্বেই রুষ্ট ছিল। কারণ বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনে ক্ষুদিরাম থেকে শুরু ক'রে বহু বিপ্লবী ও শহীদ ছিলেন মেদিনীপুরের সন্তান। এক সময় মেদিনীপুরে ইউনিয়ান বোর্ড স্থাপন ও কর আদায় করতে গিয়ে স্থানীয় সরকারি শাসকেরা বিপর্যস্ত হয়েছিলেন। পরপর তিনজন বৃটিশ ম্যাজিস্ট্রেট হত্যার পর সরকার মেদিনীপুর জেলায় আর বিদেশী ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ করতে পারেনি। 'ভারত ছাড়' আন্দোলনকে কেন্দ্র ক'রে ঐ জেলার একাংশে বৃটিশ শাসন উচ্ছেদ হ'লে সরকারের ক্রোধানলে ঘৃতাহুতি পড়লো। মন্ত্রীমণ্ডলীর মতামত গ্রহণ না ক'রেই বাংলার লাটসাহেব স্যার জন হার্বার্ট আমলাতন্ত্রের সাহায্যে সেই আন্দোলন দমনে পাশবিক শক্তি প্রয়োগ করে।

প্রকৃতির রোষানলে মেদিনীপুর ঃ সরকারি ঔদাসীন্যের প্রতিবাদ

ঠিক এই সময়েই মেদিনীপুর জেলার বিস্তীর্ণ এলাকায় আঘাত করে প্রলয়ঙ্কর ঘুর্ণিঝড় ও সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সঙ্গে রাজনৈতিক রোষ মিলে সেখানে যে হাহাকার ধ্বনি ওঠে, সে খবর যা'তে কোনক্রমেই কলকাতায় না পৌঁছায়, তার জন্য নেওয়া হয়েছিল অত্যন্ত সতর্ক ব্যবস্থা। কিন্তু যখন বিভিন্ন বেসরকারী সূত্র থেকে খবর এসে পৌঁছাল, তখন শ্যামাপ্রসাদ মেদিনীপুরের বিধ্বস্ত এলাকায় ছুটে গেলেন এবং সেখানে জনসাধারণের অবর্ণনীয় দুর্দশা আর সরকার পক্ষের অমানুষিক বর্বরতা দেখে স্তম্ভিত মর্মাহত হলেন। মন্ত্রীমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য হয়েও দুর্গত জনগণের দুঃখ-দুর্দশা অপনোদনে তিনি কোনও সক্রিয় ব্যবস্থা নিতে পারলেন না—এই বেদনায় তাঁর হৃদয় ক্ষতবিক্ষত হতে থাকলো। তার প্রতিবাদে ২০শে নভেম্বর, ১৯৪২ তিনি মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ করেন। এর কয়েকমাস পরে গভর্ণর হার্বার্ট ফজলুল হকের নেতৃত্বাধীন সংযুক্ত মন্ত্রীসভাকে বরখাস্ত ক'রে পুনরায় মুসলিম লীগের নাজিমুদ্দীন-সুরাবর্দীচক্রকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করেন (২৮ মার্চ, ১৯৪৩)।

দিনে বন্টন ঃ রাত্রে লুন্ঠন

মেদিনীপুরের বিপর্যয়ে শ্যামাপ্রসাদের প্রতিবাদী ভূমিকা আজ ইতিহাস। '১৬ই অক্টোবর, ১৯৪২। মেদিনীপুরের বুকে আছড়ে পড়লো সর্বনাশা সাইক্লোন। সমগ্র বাংলার বুকে নেমে এসেছিল অন্ধকার। মেদিনীপুরে তবু জ্বলছিল আগস্ট বিপ্লবের লেলিহান শিখা।

প্রতিশোধপরায়ণ ইংরেজ সরকার সেখানকার সাধারণ মানুষের জন্য কোনও ত্রাণের ব্যবস্থা করেনি। সাইক্লোনের সময় সকলেই আশা করেছিলেন যে রাজনৈতিক বিরোধের অবসান ঘটবে এবং সরকার ও জননেতারা একযোগে দুর্গতদের ত্রাণকার্য্যে আত্মনিয়োগ করবেন। কিন্তু আশা বিফল হয়। শ্যামাপ্রসাদ দুঃখের সঙ্গে জানান যে সিভিলিয়ানরা দুর্গতদের জন্য ত্রাণে অগ্রসর হওয়ার পরিবর্তে যা'তে অন্য স্থান থেকে সাহায্য না আসে সেই জন্য দুর্যোগের সংবাদ প্রথম ১৫ দিন চেপে রাখা হয়; কোন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হতে দেওয়া হয়নি। জেলা প্রশাসনের এই বিদ্বিষ্ট মনোভাব সম্পর্কে শ্যামাপ্রসাদ প্রকাশ্যে গুরুতর অভিযোগ করে এক বিবৃতি দেন যে, জেলাশাসক একটি রিপোর্টে অত্যন্ত অমানবিকভাবে মন্তব্য করেছেন যে, 'রাজনৈতিক দুষ্কৃতকারী'দের সাহায্য বন্ধ তো করাই উচিত, এমন কি কোন বেসরকারী প্রতিষ্ঠানকেও ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় এনে ত্রাণকার্য করতে দেওয়া উচিত নয়। গভর্ণর দীর্ঘ কালক্ষেপণের পর যে ত্রাণসামগ্রী নিয়ে এগিয়ে এলেন তার মধ্যেও ফাঁকি ছিল। সরকার দিবসে ত্রাণকার্য ও নিশীথে লুণ্ঠন ও নিপীড়ন চালাবার এক দুরভিসন্ধিমূলক আশ্রয় নিয়েছিল।' মেদিনীপুরের এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে দশ হাজার মানুষের মৃত্যু হয়, গবাদি পশুর তিন-চতুর্থাংশের মৃত্যু হয় ও প্রায় এক লক্ষ ঘরবাড়ি ধ্বংস হয়।

দুর্গতদের পাশে শ্যামাপ্রসাদ
বৃটিশ আমলাতন্ত্রের সঙ্গে তীব্র বিরোধ ঃ পদত্যাগ

সরকারের এই অমানবিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতিরোধে শ্যামাপ্রসাদ Bengal Cyclone Relief Committee গড়ে তোলেন। তাঁকে এই কমিটির সভাপতি করা হয়; ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় কোষাধ্যক্ষ ও অধ্যাপক সতীশচন্দ্র ঘোষ সম্পাদক হিসাবে কার্যভার গ্রহণ করেন। ইতিপূর্বে শ্যামাপ্রসাদ মেদিনীপুরের বিপ্লবীদের সাহায্য করার জন্য Political Sufferers Relief Committee গঠন করেছিলেন। এই ভাবে তিনি দু'দিক থেকে মেদিনীপুরের দুর্গতদের সাহায্য করতে লাগলেন—এক দিকে দুর্গত ও নিগৃহীত জনসাধারণের নিকট ত্রাণ নিয়ে যাওয়া ও অপর দিকে সরকারি অবহেলা ও অত্যাচারের বিষয় লোকচক্ষে নিয়ে আসা। মেদিনীপুর সংক্রান্ত বিষয়ে সরকারের এই বর্বরোচিত আচরণকে কেন্দ্র করেই শুরু হয় তদানীন্তন ফজলুল হক মন্ত্রীসভার অর্থমন্ত্রী ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সংগে সরকারের তীব্র বিরোধ। এই বিরোধকে কেন্দ্র করেই ডঃ মুখোপাধ্যায় ফজলুল হক মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ করেন। যা' ছিল তাঁর প্রকৃত দেশ-প্রেম ও নির্ভীকতার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। শ্যামাপ্রসাদের উপরোক্ত কর্মকাণ্ড সম্বন্ধে বাংলার গভর্ণর দিল্লিতে ভাইসরয়ের নিকট প্রেরিত গোপন রিপোর্টে লেখেন —

'Since the resignation, Dr. Mookerjee has devoted himself to exploiting the situation in Midnapore in a manner calculated to discredit. His Excellency the Governor and the Government Officials'.

কেন পদত্যাগ করেছি—শ্যামাপ্রসাদ

১৬/১২/১৯৪২ তারিখে স্যার জন হার্বার্টকে লেখা পত্রে শ্যামাপ্রসাদ মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগের কারণ বর্ণনা ক'রে লেখেন—'আমার পদত্যাগের কারণ দ্বিবিধ। প্রথমত, আমি সর্ব-প্রথম সুযোগে, ৯ই আগস্ট তারিখেই আপনাকে জানিয়েছিলাম যে বৃটিশ গভর্ণমেন্ট ও ভারত গভর্ণমেন্ট দেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে যে নীতি অবলম্বন করেছেন আমি তা' অনুমোদন করি না। আমার দ্বিতীয় কারণের সঙ্গে আপনিই প্রধানত সংশ্লিষ্ট। সেটা হচ্ছে, আমার মতে সম্পূর্ণ অবাঞ্ছিতভাবে আপনি মন্ত্রীমণ্ডলীর কাজে হস্তক্ষেপ করেছেন এবং তথাকথিত প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসনকে প্রহসনে পরিণত করেছেন।' এই পত্রটি পড়লে ২০ বছর পূর্বে লর্ড লিটনকে লেখা স্যার আশুতোষের ঐতিহাসিক পত্রটির কথা স্মরণে আসে। প্রধানমন্ত্রী ফজলুল হককে লেখা পদত্যাগ পত্রে শ্যামাপ্রসাদ লিখেছেন—'ভবিষ্যতে যাই ঘটুক না কেন, আমি এ বিশ্বাস রাখি যে বাংলার জনগণের অধিকার-রক্ষার জন্য এবং সাম্প্রদায়িক সুস্থ আবহাওয়া বজায় রাখবার জন্য আপনি ও আমি আবার একসঙ্গে কাজ করতে পারবো।' এইখানেই প্রমাণ হয় যে হিন্দু-মুসলমান জাতীয়বাদী নেতারা একসঙ্গে কাজ করার সুযোগ পেলেই সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী ও প্রতিক্রিয়াশীলদের স্বার্থ বিঘ্নিত হয়। শ্যামা-হক মিলনে ব্রিটিশ সরকার ও মুসলিম নেতৃত্বের একাংশ অত্যন্ত অসুখী ছিল।

হিন্দু-মুসলিম ঐক্য ও সংহতির আবেদন

৮ই আগস্ট, ১৯৪২, 'ভারত ছাড়' প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পূর্বে লিনলিথগো অ্যামেরির নিকট টেলিগ্রাম ক'রে জানান, ফজলুল হকের উপর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর এতটাই প্রভাব রয়েছে যে বাংলা সরকার কোন উপযুক্ত ব্যবস্থা (কংগ্রেসীদের ধরপাকড়) অবলম্বন করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করবেন। লিনলিথগো বলেন, 'Herbert is not very certain, of the attitude of Huq, who, under Syamaprasd Mookerjee's influence, shows signs of wobbling with the result that Bengal Government may be reluctant to take necessary action.' মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ করার পর বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় শ্যামাপ্রসাদ যে বিবৃতি দেন তা' তাঁর রাজনৈতিক চিন্তা ও মানবিকতার স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে সাহায্য করবে। 'পরিষদের সকল সদস্যের কাছে আমি আবেদন করছি, অত্যাচার ও নির্যাতন সমূলে উৎপাটনের জন্য সংগ্রাম আমাদের ঐক্যবদ্ধ হবে। দীর্ঘকাল আমরা পরস্পর বিবাদ ক'রে নিজেদের দুর্বল করেছি; তার ফলে শক্তিশালী হয়েছে সেইসব প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি যাদের অস্তিত্ব নির্ভর করে আমাদের ভেদ-বৈষম্যের উপর। হিন্দু কিংবা মুসলমান হিসাবে নয়, বাঙালী ও ভারতীয় হিসাবে সঙ্কটের সম্মুখীন হয়ে আসুন আমরা এমন শাসন প্রবর্ত্তনের দাবী জানাই যে শাসন আমাদের ন্যায়সঙ্গত অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকার স্বীকার করবে। হিন্দু এবং মুসলমানের মধ্যে বহু বিষয়ে মতভেদ থাকতে পারে, কিন্তু উভয়ই আমরা সমানভাবে দাসত্বকে ঘৃণা করি। অসহনীয় দাসত্বের অবসানের জন্যই আমি আজ আপনাদের সমর্থন এবং সহযোগিতা প্রার্থনা করছি।'

পঞ্চাশের মন্বন্তর ঃ মুসলিম লীগ সরকার ও ব্রিটিশ আমলাতন্ত্রের অবৈধ মিলনের ফল

১৯৪৩ সালে বাংলার দুর্ভিক্ষের সময় দুঃস্থদের সাহায্যের ব্যবস্থা। নিখিল ভারত হিন্দুমহাসভার অমৃতসর অধিবেশনে সভাপতিত্ব। ১৯৪৩ সাল হইতে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত বাংলা রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি।

ইংরেজ, মুসলিম লীগ ও মাড়োয়ারী ব্যবসাদারদের চক্রান্তে ২৮শে মার্চ, ১৯৪৩, ফজলুল হক মন্ত্রীসভার পতন ঘটে। সরকারি সমর্থনপুষ্ট নতুন মন্ত্রীসভা গড়া হল লীগনেতা খাজা নাজিমুদ্দীনের নেতৃত্বে। নাজিমুদ্দীনের শাসনকালে কলঙ্কজনক ঘটনা ১৯৪৩ সালের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ। বাংলা ১৩৫০ সালে সংঘঠিত হওয়ার ফলে সাধারণত এই দুর্ভিক্ষকে 'পঞ্চাশের মন্বন্তর' বলা হ'য়ে থাকে। প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ লোক এই দুর্ভিক্ষের বলি হয়। শ্যামাপ্রসাদ দুর্ভিক্ষ চলাকালীন অবস্থাতেই এটিকে মানুষসৃষ্ট মন্বন্তর বলে প্রমাণ করেন। তাঁর 'পঞ্চাশের মন্বন্তর' গ্রন্থখানি ভারত-ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সমকালীন দলিল।

১৯৪৩ সালে বাংলা মনুষ্য-সৃষ্ট ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে। হাজার হাজার মানুষ, হিন্দু এবং মুসলমান, ইঁদুর আর কুকুরের মতো মরতে লাগলো। কিন্তু যাদের জঘন্য চক্রান্তে ঐ দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি হয়েছিল তাদের বিরুদ্ধে মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভা একটি শব্দ পর্যন্ত উচ্চারণ করল না। যে দুর্ভিক্ষে ৩৫ লক্ষ মানুষের প্রাণহানি হয়েছিল। ঐ বিষয়ে কোন সংবাদ প্রকাশ না করতে সংবাদপত্রগুলিকে কড়া নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। ডঃ মুখার্জী একটি মাসিক পত্রিকায় বিবৃতি প্রকাশ করে এই মর্মান্তিক সংবাদ প্রথম প্রকাশ করেন, যা জানতে পেরে সারা দেশ স্তম্ভিত হয়ে যায়। এর জন্য সরকার তাঁকে ও ঐ মাসিক পত্রিকাকে সতর্ক করে দেয়। কিন্তু তিনি চুপ করে বসে থাকতে অস্বীকার করেন, তাঁর বিরুদ্ধে সরকার চরম পদক্ষেপ নিলেও তিনি তাঁর কর্তব্য পথ থেকে সরে যাবেন না বলে সংকল্প গ্রহণ করলেন। তিনি এটাকে জাতীয় প্রশ্ন করে তুললেন। আকাল-পীড়িতদের সাহায্যের জন্য তিনি যেভাবে কাজের ব্যবস্থা করলেন এবং সারা ভারতের সমাজের সমস্ত শ্রেণীর সহযোগিতা আদায় করলেন, তার দ্বারা তাঁর অদ্ভুত সংগঠন ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া গেল। তাঁর গভীর মনুষ্যত্ব-বোধ ও সেবার মনোভাবের মধ্যে কোন জাতি, বর্ণ বা প্রাদেশিকতার সংকীর্ণতা ছিল না।

মুসলিম লীগের ত্রাণ-তহবিলে কংগ্রেসের অর্থ দান

মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভার সদস্যরা এবং তাঁদের ব্যবসায়ী শ্রেণীর সহযোগীরা ক্ষমতা ভোগ দখল ও সুবিধাভোগেই অধিক তৎপর ছিলেন। বাংলার জনসাধারণের মধ্যে অধিকাংশই গরীব মুসলমান চাষী ও মজুর—তাদের প্রতিও বিশেষ সহানুভূতি দেখায়নি মন্ত্রিসভা। জাতির এই রকম চরম দুঃসময়ে কংগ্রেসও ক্ষুদ্র রাজনৈতিক স্বার্থ বিসর্জন দিতে প্রস্তুত ছিল না। মুসলিম লীগের দলীয় তরফ থেকে শুধু দুর্ভিক্ষপীড়িত মুসলমান জনসাধারণকে ত্রাণ ও সাহায্যের কথা ঘোষণা করা হল। তা' সত্ত্বেও কংগ্রেসের তরফ থেকে লীগের ত্রাণ তহবিলে সাহায্য দিতে জনসাধারণের নিকট আবেদন জানানো হল। কংগ্রেস নেতা জি. ডি. বিড়লা নিজে মুসলিম লীগের তহবিলে প্রচুর দান করলেন।

দুর্ভিক্ষ পীড়িতদের সাহায্যার্থে শ্যামাপ্রসাদ ও হিন্দু মহাসভা

বাংলার দুর্ভিক্ষপীড়িত অনাহার ক্লিষ্ট মানুষকে বাঁচাতে এগিয়ে এলেন শ্যামাপ্রসাদ। সরকারি সাহায্যের উপর কোন ভরসা না রেখে তিনি Bengal Relief Committee গড়ে তুললেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে হিন্দু মহাসভার নাম তিনি ত্রাণ ও সেবাকার্যের স্বার্থে জড়াতে চাননি। তিনি এই সংগঠনে সর্বমতের মানুষের সহযোগিতা ও সাহায্য চেয়েছিলেন। তবুও Bengal Relief Committee-র পশ্চাতে কোন রাজনৈতিক শক্তি সক্রিয় তা' সরকারি গোয়েন্দা রিপোর্টে স্পষ্ট হ'য়ে যায়। সেখানে লেখা হয়ঃ

'The only Party that stood out to view and treat the problem of famine on humanitarian ground and keep it beyond the purview of political gain was the Bengal Hindu Mahasabha in the person of Dr. Syamaprasad Mookerjee'.

এরপর শ্যামাপ্রসাদের উপর চারদিক থেকে চাপ সৃষ্টি হ'তে লাগলো যে হিন্দু মহাসভার বিশ্বাসযোগ্যতা প্রমাণের যে সুযোগ পাওয়া গিয়েছে তার পূর্ণ সুযোগ ও দায়িত্ব গ্রহণ করা উচিত। অনেক ভাবনা-চিন্তার পর তবেই Bengal Relief Committee-কে Hindu Mahasabha Relief Committee-তে রূপান্তরিত করা হয়। বাংলার এই দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষদের সাহায্যের জন্য শ্যামাপ্রসাদ সেদিন ভারতের সমস্ত আইন সভার সদস্যদের নিকট যে আবেদন জানিয়েছিলেন তা' থেকে মানবতাবাদী শ্যামাপ্রসাদকে চিনে নেওয়া যায়। আইন সভার সমস্ত সদস্যদের কাছে তিনি আবেদন করেন— 'We get now Rs. 40/- per day. I do not know what will be hereafter. Let us agree to a voluntary cut of Rs. 10/- per day and let us apart this sum for the purpose of opening homes where these women and childern may be housed and fed.' কিন্তু শ্যামাপ্রসাদের ডাকে কোন সাংসদ সেদিন সাড়া দেননি।

দুর্ভিক্ষ পীড়িত হিন্দু শিশুদের ইসলামে দীক্ষাঃ মুসলমান সংখ্যা বাড়াতে বর্বরতা ইতরতার আশ্রয়

ত্রাণকার্য নিয়ে নানা রকম দুর্নীতি আরম্ভ হল। মনুষ্যত্বের চরম লাঞ্ছনা ও দুর্গতির মাঝে খাকসার পার্টি সমেত অন্যান্য সাহায্যকারী প্রতিষ্ঠান দুর্গতদের আশ্রয় ও খাদ্যদানের জন্য বাংলার বাইরে শিবির খোলে এবং সেখানে অনাথ হিন্দু বালক-বালিকাদের ধর্মান্তরণ করায়। এই ঘটনা জানাজানি হ'লে বিশেষ উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। শ্যামাপ্রসাদ তৎক্ষণাৎ কলকাতাস্থ খাকসার পার্টির নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ ক'রে ঐ সব হিন্দু বালক বালিকাদের অবিলম্বে হিন্দুমহাসভা ও অন্যান্য ত্রাণসংগঠনের হস্তে তুলে দেওয়ার দাবী জানান এবং বাংলা থেকে নাবালক দুর্গতদের বাইরে পাঠানো বন্ধ করতে বলেন। শেষ পর্যন্ত শ্যামাপ্রসাদ ও অন্যান্য সংগঠন সরকারকে ঐ দাবী কার্যকর করতে বাধ্য করেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

জাতীয় রাজনৈতিক ঘটনাবর্তে শ্যামাপ্রসাদ

সি. আর. ফর্মুলা

"১৯৪৪ সালের সংবাদপত্রে দেখা যায় যে, রাজাগোপালাচারী মিঃ জিন্নার নিকট লিখিত এক পত্রে প্রকারান্তরে (সামান্য মুসলমান সংখ্যা-গরিষ্ঠ বাংলা সহ) পাকিস্তানের প্রস্তাব দিয়াছেন এবং মহাত্মা গান্ধী সমর্থন করিয়াছেন। ইহাতে বিচলিত হইয়া ডঃ মুখোপাধ্যায় সেবাগ্রামে যাইয়া গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া উক্ত পরিকল্পনায় সম্মতি না দিতে অনুরোধ করেন।"

এই সময়ে কংগ্রেস নেতা শ্রী সি. রাজাগোপালাচারী গান্ধীজীর পরামর্শে এমন একটি ফরমুলা বা সমাধান-সূত্র উপস্থাপিত করলেন যা প্রকৃতপক্ষে মুসলিম-লীগের পাকিস্তানকে স্বীকার করে নেওয়ারই সামিল। কিছুকাল পর্যন্ত এক শ্রেণীর কংগ্রেস-কর্মী এর তীব্র সমালোচনা করলেন। কিন্তু সি. আর. কংগ্রেসের চিন্তানায়ক বিশেষজ্ঞ বলে পরিচিত ছিলেন এবং গান্ধীজীর উপর তাঁর প্রভাব ছিল সুবিদিত। অতএব লীগের মধ্যে এই ধারণার সৃষ্টি হল যে কংগ্রেস নতি স্বীকার করছে। যে বিষয়টিকে শুধু একটা দর-কষাকষির অস্ত্র বলেই তুলে ধরা হয়েছিল, সেটা এখন বুঝি তাদের মুঠোর মধ্যে এসে গেছে বলে মনে হল! তারা এই পরিস্থিতির সুযোগ নেবার সিদ্ধান্ত নিল এবং তাদের আন্দোলনের তীব্রতাকে বাড়িয়ে দিল।

এই নূতন পরিস্থিতি উপলব্ধি করতে ডঃ মুখার্জীর বেশী সময় লাগেনি। তিনি দেশবাসীকে আসন্ন সংকটের বিষয়ে সতর্ক করে দিলেন এবং সমস্ত জাতীয়তাবাদী শক্তিকে কংগ্রেসের আত্ম-সমর্পণের নীতির বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ প্রতিরোধের আহ্বান জানালেন।

গান্ধী-জিন্না সাক্ষাৎকার ঃ শ্যামাপ্রসাদের তীব্র বিরোধিতা

১৯৪৪ সালে জেল থেকে বেরিয়েই গান্ধী ঘোষণা করলেন যে তিনি মুসলিম লীগ সভাপতি মহম্মদ আলী জিন্নার সঙ্গে আলোচনায় বসবেন। শ্যামাপ্রসাদ গান্ধীজীর ঘোষণা শুনে প্রমাদ গুনলেন। কারণ শ্যামাপ্রসাদ জানতেন যে আলোচনার নাম করে গান্ধীজী জিন্নার কাছে গিয়ে অপমানজনকভাবে আত্মসমর্পণ করবেন। সেই সময় বাংলায় মুসলিম লীগের জনসমর্থন ছিল নিম্নগামী! মন্বন্তর এবং বস্ত্র দুর্ভিক্ষের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলায় লীগের সমর্থন তলানিতে এসে ঠেকেছিল। শ্যামাপ্রসাদ গান্ধীজীকে অনুরোধ করলেন যে তিনি যেন লীগের এই দুরবস্থায় জিন্নাকে গুরুত্ব দিয়ে মুসলিম লীগের পরিত্রাতার ভূমিকা পালন না করেন। এর জন্য প্রয়োজন হলে তিনি গান্ধীজীর বিরুদ্ধে জনমত গঠন করবেন বলে শ্যামাপ্রসাদ তাঁকে জানালেন। এই পরিস্থিতি সম্পর্কে সরকারের গোপন নথিতে মন্তব্য করা হল ঃ "It seems clear that Dr. Shyama Prasad Mukherjee puts his case very strongly to Gandhi and did not mince matters. Former is the most determined character who will stick at nothing and I shall say he will get a good deal of support from many Congressmen, especially in Bengal. One report states

that he reminded Gandhi that he had said on one occasion that indivisibility of India is his God and 'Vivisect me before you vivisect India."

১৯শে জুলাই ১৯৪৪, শ্যামাপ্রসাদ গান্ধীজীকে একটা চিঠি লিখলেন। চিঠিতে তিনি গান্ধীজীকে বার বার অনুরোধ করেন যে কোন অবস্থাতেই যেন ভারত বিভাগ তিনি মেনে না নেন। শ্যামাপ্রসাদ তাঁর চিঠিতে লিখলেন, "সত্যি কথা বলতে কি, রাজা গোপালাচারী জিন্নার কাছে যে সূত্র (Formula) দিয়েছেন তাতে আমি বিচলিত হয়ে উঠেছি। আমরা হিন্দু-মুসলমান সমস্যার সমাধানে আগ্রহী। কিন্তু গোপালাচারী যেভাবে বিষয়টির ইতি টানতে চাইছেন আমরা তাঁর সাথে একমত নই। আপনার পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে জিন্না কোন সমাধানে আগ্রহী নন। তিনি নিজেকে ভারতীয় বলে মনে করেন না। স্বাধীনতার জন্য প্রজন্মের পর প্রজন্ম যে আত্মাহুতি দিয়ে চলেছে তাতেও জিন্নার কোন আগ্রহ নেই। বাংলা এবং ভারতের যে কোনও ধরনের বিভাজন আমরা তীব্রভাবে ঘৃণা করি—শ্যামাপ্রসাদ তাঁর পত্রে গান্ধীজীকে আরও লিখলেন ঃ "আমরা আপনাকে কংগ্রেস থেকে আলাদা মনে করি, কিন্তু এ বিষয়ে আপনার অঙ্গীকার আমাদের প্রচণ্ড অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যে ফেলেছে। আমাদের ভয় জিন্না এই প্রস্তাবকে Spring Board হিসাবে ব্যবহার করবেন এবং হিন্দুস্তান ভাগ ও পাকিস্তান গঠনের কাজে এই Spring Board কে কাজে লাগাবেন। ফলে আরো বেশী বিশৃঙ্খলা ও অব্যবস্থার সৃষ্টি হবে। জিন্নাকে খুশি করা যাবে না। কারণ তিনি এই সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান চান না। মাঝখান থেকে আপনার এই অনুমোদন ভবিষ্যতের জন্য সমস্যার সৃষ্টি করবে। আপনার প্রস্তাব পুনরায় ভেবে দেখার জন্য আমি আপনাকে অনুরোধ জানাচ্ছি। মাত্র কয়দিন আগে আপনি নিজেই হরিজন পত্রিকায় লিখেছেন যে দেশভাগের যে কোনও চিন্তা-ভাবনা আমাদের মধ্যে নতুন ধরনের বিবাদ ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করবে।"

অতঃপর চিঠিতে শ্যামাপ্রসাদ আরও বলেন, "আমার মনে হয়, আপনার পরিষ্কার করে বলা উচিত যে দেশের স্বাধীনতা কেবলমাত্র সমস্ত রাজনৈতিক দল এবং সম্প্রদায়ের ঐক্যবদ্ধ সহযোগিতাতেই পাওয়া সম্ভব। যারা সমগ্র দেশের স্বাধীনতা চায় তাদের এই আন্দোলনে যোগ দিতে আহ্বান জানানো হোক। অনেক মুসলমানও আজ বুঝতে পারছেন যে পাকিস্তান অবাস্তব চিন্তা ভাবনা। বৃটিশ সরকারও জিন্নার উপর ভরসা হারিয়ে ফেলেছে। ঠিক এইরকম একটা সময়ে আপনি জিন্নাকে তুলে ধরতে চাইছেন যেন কেবলমাত্র জিন্নাই দেশের মুসলমানদের ভাল করতে পারেন। যে মুসলমানেরা লীগের রাজনীতিতে বিশ্বাস করেন না এবং জাতীয় আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে চান তাদের কাছে এটা অবশ্যই একটা বড় আঘাত।

আপনি জানিয়েছেন যে, আপনি যখন আপনার শর্ত নিয়ে আলোচনা করবেন তখন একজন ভারতীয় হিসাবে এই আলোচনা করবেন, হিন্দু হিসাবে নয় নিশ্চয়ই। কিন্তু একজন ভারতীয় হিসাবে যখন আপনি শুধু মুসলমানদের দাবি নিয়েই চিন্তা ভাবনা করেন এবং এই ব্যাপারে জিন্নাকেও তোষণ করতে প্রস্তুত, তখন আমিও একজন ভারতীয় হিসাবে হিন্দুদের ন্যায্য অধিকার ও দাবির কথা তুলতে পারব না কেন ? যদি একজন ভারতীয় হিসাবেই আপনি আপনার পরিচয় দিতে চান, তবে আমার অনুরোধ, একজন ভারতীয় হিসাবে কেবলমাত্র ভারতীয়দের কথাই চিন্তা করুন।" (দূরদর্শী রাজনীতিক শ্যামাপ্রসাদ-শ্যামলেশ দাশ)

দেশ ভাগ সম্পর্কে কংগ্রেসের ধাপ্পা ও ধোঁকাবাজিঃ কংগ্রেস হিন্দুস্বার্থ বিরোধী হিন্দু প্রতিষ্ঠান বলে স্বীকার

তাঁর আবেদনে জনসাধারণের বিপুল সাড়া পাওয়া গেল। কংগ্রেস নেতৃত্ব উপলব্ধি করল যে তাদের পায়ের তলার মাটি সরে যাচ্ছে। সুতরাং তারা দেশবাসীর সামনে নিজেদের সততা ও আন্তরিকতার কথা তুলে ধরার সিদ্ধান্ত নিল। সর্দার প্যাটেল কলকাতায় এসে শ্যামাপ্রসাদের সঙ্গে দেখা করলেন এবং তাঁকে প্রতিশ্রুতি দিলেন যে কংগ্রেস পাকিস্তানের দাবী মেনে নেবে না। মহাত্মা গান্ধীও তাঁকে অনুরূপ আশ্বাস দিলেন এবং একটি আলাদা মোর্চা গঠন না করার জন্য অনুরোধ করলেন। ডঃ মুখার্জী তাঁদের কথা মেনে নিলেন। কিন্তু কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটি তাদের পুনা প্রস্তাবে সংযুক্ত ভারতের প্রশ্নটিকে আস্তাকুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল। ভারতের ঐক্য সম্বন্ধে ঐ প্রস্তাবে "পবিত্র আস্থা" প্রকাশ করা হলেও প্রস্তাবের শেষে ঘোষণা করা হয় যে দেশের অনিচ্ছুক অংশগুলিকে ভারতের মধ্যে থেকে যাবার জন্য কোন জোর জবর্দস্তি করা হবে না। কিন্তু ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে জয়লাভের উদ্দেশ্যে ঐ প্রস্তাবের শুধু প্রথম অংশটিকেই প্রচার করা হল, যার মধ্যে দেশবিভাগকে সম্পূর্ণ অযৌক্তিক বলে বর্ণনা করে দেশের অখণ্ডতা পুরোপুরি অব্যাহত রাখার ব্যাপারে কংগ্রেসের ইচ্ছা প্রকাশ করা হয়।

প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে জনসাধারণকে এইভাবে সবচেয়ে বড় ধাপ্পাটি দেওয়া হল। হিন্দুরা কংগ্রেসের কথায় বিশ্বাস করে যেখানেই তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল, সেখানেই কংগ্রেসকে ভোট দিয়ে জয়ী করল। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ছাড়া সমস্ত মুসলিম আসনে লীগ জয়ী হল। বাংলায় মুসলিম লীগের সরকারকে ক্ষমতায় বসান হলো এবং মুসলিম লীগের নেতারা দেশবিভাগের দাবীতে আরো প্রবল আন্দোলন গড়ে তুললেন।

১৯৪৪. সালে শ্যামাপ্রসাদ ইংরেজী দৈনিক পত্রিকা 'ন্যাশনালিষ্ট' ও বাংলা দৈনিক 'হিন্দুস্থান'- প্রকাশ করেন এবং নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভার বিলাসপুর অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন।

১৯৪৫ সালে কংগ্রেস নেতাদের কারামুক্তির ফলে দেশে এক নূতন পরিস্থিতির সৃষ্টি হল। এঁদের মনোবল ভেঙে পড়েছিল এবং ক্ষমতা-লাভের জন্য এঁরা অধৈর্য হয়ে উঠেছিলেন। ইতিমধ্যে ব্রিটিশদের প্রত্যক্ষ সাহায্যে ও উৎসাহদানের ফলে মুসলিম লীগ মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে যথেষ্ট শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। পাকিস্তানের দাবী জোরদার হয়েছিল এবং মুসলিম লীগকে ভারতের মুসলমানদের প্রতিনিধি সংগঠন রূপে সরকার স্বীকৃতি দিয়েছিল।

১৯৪৫ সালে লর্ড ওয়াভেল যখন ওয়াভেল-পরিকল্পনা লইয়া বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সহিত আলোচনা করেন তখন শ্যামাপ্রসাদই প্রথম উহার তীব্র নিন্দা করেন। হিন্দু মহাসভাকে বাদ দিয়ে মুসলমানদের পক্ষ থেকে জিন্না এবং হিন্দুদের পক্ষ থেকে গান্ধী ঐ বৈঠকে যোগ দিয়ে কংগ্রেস যে একটি হিন্দু প্রতিষ্ঠান সে কথা প্রকারান্তরে স্বীকার করে নেয়। কংগ্রেসের ভারতীয় জনগণের একমাত্র প্রতিনিধির দাবী মিথ্যা ও অসার বলে প্রমাণ করে।

সপ্তম অধ্যায়

আই. এন. এ. বন্দী মুক্তি আন্দোলনে শ্যামাপ্রসাদ জালিয়ানওয়ালাবাগের পুনরানুষ্ঠান প্রতিহত

এই বৎসর নভেম্বর মাসে আজাদহিন্দ-ফৌজ-বিচার-প্রতিবাদ-দিবস উপলক্ষ্যে পুলিশের গুলিবর্ষণে কলকাতায় গোলযোগ সৃষ্টি হয়। ছাত্রদের বিরাট শোভাযাত্রা রাজপথ অতিক্রম করিবার সময় কয়েকজন ছাত্র পুলিশের গুলিতে আহত হয় এবং রামেশ্বর ব্যানার্জী নামক এক ছাত্র হাসপাতালে মারা যায়। ঐদিন শ্যামাপ্রসাদ কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করিয়া ঐ বিষয়ের মধ্যস্থতা করেন এবং পরদিন তাঁহার নেতৃত্বে মৃতদেহ শোভাযাত্রা সহকারে লইয়া যাওয়া হয়।

সেদিন শ্যামাপ্রসাদের সাহস, ধৈর্য, ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে কলকাতার বুকে দ্বিতীয় জালিয়ানওয়ালাবাগ অনুষ্ঠিত হবার হাত থেকে রক্ষা পায়। বাংলার কোনও জননেতারই সেদিন লক্ষাধিক বিক্ষুব্ধ ছাত্র -যুবকের সম্মুখীন হবার সাহস হয়নি। ব্যতিক্রম একমাত্র ডঃ মুখার্জী এবং তৎসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ রাধাবিনোদ পাল।

রামেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুঃ বিপদ-তারণের ভূমিকায় শ্যামাপ্রসাদ

তিনি তাঁর ডায়েরীতে লিখেছেন, "২২শে নভেম্বর ভোরে বেরিয়ে গেলাম দেবেনবাবুর (মেয়রের) সঙ্গে বারাসত, বসিরহাট, টাকী, বাদুড়িয়া—এই সব জায়গায় যাব বলে। অনেকেই এলেন সব জায়গায়—খুব সাড়া পড়ে গেল। টাকীতে কয়েকজন ছেলে আমার বিরুদ্ধে খানিক চীৎকার করে কংগ্রেসের জয়গান করল। সব জায়গায় বড় মিটিং করে বাড়ী ফিরলাম, তখন প্রায় রাত ৯টা বাজে। শরীর অসম্ভব রকমের ক্লান্ত বোধ হচ্ছিল। শুনলাম সেদিন কলকাতায় খুব মারামারি হয়েছে—গুলি পর্যন্ত চলেছে। বৈকাল থেকে ছেলেরা আমাকে খুঁজেছিল। আজাদ হিন্দ ফৌজ নিয়ে ছেলেরা মিটিং ও শোভাযাত্রা করে। ধর্মতলা স্ট্রীট দিয়ে শোভাযাত্রা যাবার সময় পুলিশ বাধা দেয়। শোভাযাত্রা ডালহৌসী স্ট্রীট দিয়ে লালবাজার ও লালদিঘীর পাশ হয়ে যাবার সংকল্প করেছিল। পুলিশ বলে সেটা prohibited area ছেলেরা তা জানত না বলে ও মানতে স্বীকার করে না। এই নিয়ে গোলমাল সৃষ্টি হয়। লাঠি চলে, গুলি চলে ও অনেকগুলি লোক হত ও আহত হয়। নানা রকমের বিবরণ শোনা যেতে লাগল—কিন্তু সঠিক কথা কেউ বলতে পারল না।

আমি রাধাবিনোদ পালকে (তৎকালীন উপাচার্য) টেলিফোন করে বল্লাম যে ছাত্রদের এই বিপদে আমাদের ঘটনাস্থলে যাওয়া উচিত। তিনি বিধান রায়কেও খবর দিলেন। আমি ডঃ পালের বাড়ীতে গেলাম—রাত তখন প্রায় সাড়ে ৯টা। সারাদিনের ঘোরা ও পরিশ্রমের পর বাড়ী ফিরে মুখহাত ধোবার সময় হল না। শরীর টেনে চলবার মত শক্তি ছিল না। ডঃ পাল শুনলাম বিধানবাবুর বাড়ীর দিকে চলে গেছেন। আমি মেডিক্যাল কলেজে গেলাম। পেটে

খুব ভীড়। আমাকে দেখে পথ ছেড়ে দিল। ভিতরে গেলাম—খুব চাঞ্চল্য দেখলাম চারদিকে। নানা গুজব রটছে। আমি প্রিন্সিপাল লিনটন সাহেবের কাছে গেলাম। তিনি তাঁর বাড়ীতে চলে গিয়েছিলেন। নেমে এলেন তখনই। তাঁর দিক থেকে বলার বিশেষ কিছু ছিল না। যথাসাধ্য শুশ্রূষার চেষ্টা করছেন বল্লেন। বাহিরে আত্মীয়স্বজনেরা কে ভিতরে আছেন তার সংবাদ পাচ্ছিল না, বা ভিতরে এসে দেখবার অনুমতি পাচ্ছিল না। আমি এই কথা বলাতে তিনি বল্লেন যে পুলিশে বাধা দিচ্ছে বলে তিনি ভিতরে আসতে দিতে পারছেন না। তাঁর দিক থেকে কোন আপত্তি থাকতে পারে না। যাতে গেটের উপর দাঁড়িয়ে হতাহতদের নাম অন্তত পড়ে শোনানো হয়, তার ব্যবস্থা করা হল। এমন সময় ডাঃ পাল ও রায় এলেন। তাঁদের সঙ্গে নিয়ে গভর্মেন্ট হাউসে টেলিফোন করা হল। কি ব্যাপার ঘটেছে এবং যাতে আর কিছু না হয় এই বলার উদ্দেশ্য ছিল। Tyson সাহেবের সঙ্গে কথা হল ডাঃ রায়ের।

এই সময় খবর পেলাম যে ধর্মতলা স্ট্রীটে তখনও অবস্থা খুব আশঙ্কাজনক। বহু সহস্র ছাত্র সেখানে বসে আছে রাস্তার উপর। তার সামনে দাঁড়িয়ে লাঠিসোঁটা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে পুলিশ। আমাদের সেখানে যাবার জন্য সবাই অনুরোধ করলো। বিধানবাবু বাড়ী গেলেন, জরুরী এক কেস তখন তাঁর বাড়ীতে দেখতে হবে। ডাঃ পাল আর আমি গেলাম। ধর্মতলার মোড়ে মোটর যেতে পুলিশ এসে আটকে দিল। তারপর চিনতে পেরে ছেড়ে দিলে। ওছাই মোল্লার দোকানের কাছে মোড়ের উপর দেখলাম রণসজ্জা। পুলিশ বহুসংখ্যক, তারা সাজসজ্জা নিয়ে প্রস্তুত। সামনে ছেলের দল—চীৎকার করছে—সব মাটিতে স্থির হয়ে বসে আছে। শুনলাম লাটসাহেব সেখানে উপস্থিত। আমরা এসেছি শুনে তিনি এগিয়ে এলেন। আমাদের অনুরোধ করলেন ছেলেদের বলতে তারা যেন এখন রাস্তা থেকে উঠে বাড়ী চলে যায়।

আমি ছেলেদের কাছে এগিয়ে গেলাম। তারা বিপুল ধ্বনি করে চেঁচিয়ে উঠল। শুনলাম বৈকাল থেকে তারা শরৎ বোস ও আমাকে খবর দিতে বলেছিল। শরৎ বোস আসতে অস্বীকার করেছেন। তিনি এক লিখিত বাণী পাঠিয়ে দিয়েছিলেন—ছেলেদের ব্যবহারে দুঃখ প্রকাশ করে ও তাদের শান্ত ছেলের মত বাড়ী ফিরতে। কাদের প্ররোচনায় নাকি এইসব গণ্ডগোল হয়েছে এবং তাদের উদ্দেশ্য ছিল শরৎ বোসকে ফাঁদে ফেলতে। তিনি তাই এলেন না। আমি মুখে কিছু বল্লাম না—কিন্তু অবাক হলাম শরৎবাবুর নেতৃত্বের অভিনয় দেখে। বড় বড় বক্তৃতা করে ছেলেদের গুলির সামনে বুক পেতে দাঁড়াতে আহ্বান করে, তাদের মাতিয়ে তুলে, যখন তারা সত্যিকারের গুলির সামনে বুক পেতে দিল, গুলি হজম করল, গুলি খেয়েও পথ ছাড়ল না—তখন বাণী এল নেতার যে তোমরা ভুল করছ, এখন সব বাড়ী ফিরে যাও। চমৎকার দায়িত্ববোধ!

ছেলেরা ঠিক করেছিল কিনা, সে কথা বিচার করার সময় তখন ছিল না। তখন তারা একটা বড় বিপদের সম্মুখীন হয়েছিল—যাঁরা নেতৃত্বের দোহাই দেন তাঁদের তখন উচিত সেখানে ছেলেদের পাশে এসে দাঁড়ানো। আমি বীণা দাসের সঙ্গে কথা বললাম। শুনলাম

শরৎবাবুর বাণীকে ছেলেরা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলেছিল। সে কাগজগুলো দেখলাম যুগান্তরের রিপোর্টার সুশীলের কাছে। জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলী এলেন, তাঁর সঙ্গে কথা হল। তিনি শরৎবাবুর ব্যবহারে খুব মর্মাহত হয়েছিলেন। তাঁর বাড়ীতে গিয়েছিলেন তাঁকে আনতে। সেখানে পারিষদবর্গ পরিবেষ্টিত হয়ে নেতা মহারাজ বসে ছিলেন—তাঁরা বল্লেন যে তাঁরা শরৎবাবুকে এই বিপদের মধ্যে যেতে দিতে পারেন না। বাংলায় আর নেতা নেই—শরৎবাবু সেখানে গেলে কোন অজুহাতে হয়ত তাঁরই মাথায় লাঠির ঘা বা গুলির আঘাত পড়বে। এত বড় একটা বিপদের সম্ভাবনা যেখানে সেখানে শরৎবাবু যান কি ভাবে? ইত্যাদি। এই বেলুন ফাটার মত শরৎ বোসের নেতৃত্বের ভণ্ডামি ধরা পড়ল—প্রভেদ তাঁর সঙ্গে আর সুভাষের কতটা তাও বুঝতে পারা গেল। কিরণশঙ্কর রায়কে তিনি ঘটনাস্থলে পাঠিয়েছিলেন। তিনিও কিছু করতে পারেন নি।

যা হোক্ ছেলেরা নড়তে অস্বীকার করলো। তারা যে পথে যাবার জন্য যাত্রা করেছিল, সেই পথে তারা যাবেই—তাদের সহযাত্রীরা প্রাণ দিয়েছে হাসতে হাসতে, তারা তাদের অপমান করতে পারে না। তখন তারা বাস্তবিকই অটল হয়ে ছিল। কোনরূপ মারামারি বা গোলমাল করার উদ্দেশ্য তাদের ছিল না—শান্তিপূর্ণভাবে কথা বলল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম যে নিষিদ্ধ পথের খানিকটা যদি আমরা যেতে পারি, তাহলে Curzon Park-এ গিয়ে আমরা সভা করে চলে যেতে পারি। আমি Casey সাহেবকে, Commissioner of Police Ray সাহেবকে অনুরোধ করলাম যে ছেলেরা যে পথে যেতে চায়, তাদের যেতে দেওয়া হউক। তারা শান্তিপূর্ণভাবে যাবে, কোন গোলমাল হবে না। কিন্তু তাঁরাও অটল—কেননা তাঁরা prestige ভাঙ্গতে চান না—প্রাণ যায় তাও স্বীকার। এইভাবে দুপক্ষে টানাটানি চলতে থাকল। দেখলাম শ্বেতাঙ্গ পুলিশ এক দল আছে, তাদের হাত যেন কামড়াচ্ছিল—লাটসাহেব চলে গেলে একটু সুবিধা পেলে তারা একবার নিরস্ত্র জনতার উপর তাদের পাশবিক শক্তির প্রভাব ভাল করে দেখিয়ে দিতে পারে। ছেলেরা এবং পুলিশের কোন কোন লোক আমায় চলে আসতে মানা করেন। আমার উপস্থিতিতে অন্ততঃ আর প্রাণহানির সম্ভাবনা থাকবে না। জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলীও—কে জানত যে বেচারী তার পরদিনই জীবনলীলা শেষ করবেন—এই মত প্রকাশ করলেন। তিনিও অস্থির হয়ে ঘুরছিলেন।

খানিক পরে দেখলাম সুরেশ মজুমদার আর দু-একজন কংগ্রেসের লোকেরা এলেন। তাঁদের camp এ তখন খবর পৌঁছেছে যে আমি ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়েছি। আমার কোন Political উদ্দেশ্য ছিল না—আমি চেয়েছিলাম এই বিপদের সময় দলাদলি ভুলে কোনরকমে ছেলেদের বাঁচাই। এই ভেবে শরৎবাবুকে টেলিফোন করতে চেষ্টা করলাম ক'বার—বায়স্কোপের অফিস থেকে। কিন্তু কোন সাড়াই পেলাম না। রাত তিনটা পর্যন্ত সেখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম। ছেলেদের সঙ্গে কথা বলে তাদের আশ্বাস দিয়ে সব রকমে যাতে কোন গোলমাল না হয়। তাই দেখে বাড়ী ফিরলাম। শরীরের এমন অবস্থা যে আর গাড়ী থেকে নামতে পারি না। ডাঃ

পালও অত রাত পর্যন্ত তাঁর গাড়ীতে বসেছিলেন, কখনো রাস্তায় ঘুরছিলেন। আমাকে একলা রেখে তিনি চলে আসতে রাজী হন নি। এইভাবে সে রাত কাটল।

পরদিন সকালে ইউনিভার্সিটিতে ১০টায় ডাঃ পালের সঙ্গে আলোচনা করার জন্য গেলাম—স্কুল কলেজ যেন বন্ধ থাকে ক'দিন। তা নাহলে আরো গোলমাল হতে পারে। সেই ব্যবস্থা করে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে গেলাম। যেসব ছেলেরা আহত হয়েছিল তাদের প্রত্যেককে দেখলাম—তাদের বিষয়ে সংবাদ নিলাম। কলেজ ও হাসপাতাল কম্পাউণ্ড লোকে লোকারণ্য। হাসপাতালে ঢোকবার জন্য সবাই ব্যাকুল। ডাক্তারেরা আমাদের বলতে বল্লেন সকলকে বুঝিয়ে দিতে যেন তারা রোগীদের দেখার চেষ্টা না করে—অত ভীড় সামলান কঠিন হবে, আর তা ছাড়া সেটা রোগীদের পক্ষেও মঙ্গলজনক হবে না। বুঝিয়ে বললে সকলে শান্ত হয়ে শুনল। এক ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন, তাঁর ভাইপো রামেশ্বর বাঁড়ুয্যে গুলিতে প্রথম মারা গেছে, তার দেহ তখনও পাওয়া যায়নি—পুলিশ দেরী করছে। তাঁকে আর তাঁর সঙ্গে দুজন ছিলেন, তাঁদের নিয়ে ইউনির্ভাসিটি গেলাম। হেঁটে ওইটুকু পথ গেলাম। তখনই খুব ভীড় চারদিকে। ছেলের দল বন্যায় বাঁধ ভাঙার মত তরতর করে এগিয়ে আসছে। প্রেসিডেন্সী কলেজের ছেলেদের দল আসছে দেখলাম। ধর্মতলা স্ট্রীটের ছেলেরা ভোরের দিকে বেন্‌টিঙ্ক স্ট্রীট হয়ে চলে গেছল এ খবর পেয়েছিলাম। ইউনির্ভাসিটি থেকে পুলিশে টেলিফোন করলাম। হরিদাসবাবু আর হরিচরণ এলেন, তাঁদেরও পাঠিয়ে দিলাম।

বাড়ী এসে খেতে প্রায় ১টা বাজল। বিশ্রাম করার সময় পাইনি। শুনলাম ছেলেমেয়ের দল হাজারে হাজারে সব ওয়েলিংটন স্কোয়ারে জড় হচ্ছে। খানিক পরে খবর এল যে তারা সব ধর্মতলা স্ট্রীট দিয়ে যে পথে কাল তারা যেতে গিয়ে গুলি খেয়েছিল, সেই পথ দিয়েই চলছে। একটু পরেই খবর এল যে পুলিশ জনতাকে আটকেছে ও গুলি চলার মত অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। কর্পোরেশন থেকে খবর এল যে এখনই সেখানে যাওয়া দরকার, অবস্থা খুব সঙ্গীন। শরৎবাবুর কথা আমি জিজ্ঞাসা করাতে জবাব পেলাম যে তাঁর খবর পাওয়া যাচ্ছে না, বোধহয় তিনি কোর্টে কোন কেসে আটকে পড়েছেন। পরে শুনলাম তিনি ওয়েলিংটন্ স্কোয়ারের এক ধারে গিয়ে কিছু বলেছিলেন, কিন্তু কাল তাঁর না আসার দরুণ ছেলেদের মধ্যে খুব বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছিল।

আমি ধর্মতলা স্ট্রীটে যাব বলে তৈরী হলাম। রামেশ্বর ব্যানার্জীর দেহ নিয়ে যাবার ছাড়পত্র হরিচরণ পুলিশ অফিস থেকে আমার কাছে এনে দিল। নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার, মীরা দত্তগুপ্ত তার বাবা ও মাকে মোটর করে নিয়ে আমার বাড়ীতে এলেন। মর্গে নিয়ে একবার ছেলের মৃতদেহ দেখবার জন্য হতভাগ্য পিতামাতার এই যাত্রা। রাস্তায় গেলাম তাঁদের গাড়ীর কাছে। অবাক হলাম তাঁদের—বিশেষ ক'রে মাকে দেখে। খুব সহজ ভাবে এই আকস্মিক বিপদকে তাঁরা গ্রহণ করতে পেরেছেন দেখলাম। দেশের জন্য ছেলে ইংরেজের গুলিতে প্রাণ হারিয়েছে—এতে শোকের কান্না তাঁরা কাঁদতে চান না। ছাড়পত্র মীরার হাতে দিলাম। নীহারেন্দু আমার

সঙ্গে ধর্মতলায় চল্‌ল। সেখানে গিয়ে দেখি বিরাট ও সঙ্গীন ব্যাপার। লক্ষাধিক লোক সারা রাস্তা জুড়ে দাঁড়িয়ে—সবাই নিষিদ্ধ পথে এগিয়ে যেতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। রাস্তার মাঝখানে পুলিস কমিশনার ও অন্যান্য কর্মচারীরা দাঁড়িয়ে। ইংরেজের গুলিগোলা সবই সাজান রয়েছে—নিরস্ত্র জনতার উপর চালিয়ে শক্তির মহিমা প্রচার করতে যেন শশব্যস্ত। কংগ্রেসের নলিনাক্ষ আর দু' একজনকে দেখলাম। শরৎবাবু বলে দিয়েছেন ছেলেদের ওয়েলিংটন স্কোয়ারে ফিরে যেতে, কিন্তু তারা যাবে না। কিছুতেই—প্রাণ যায় ক্ষতি নেই। পুলিশ কমিশনারের হুমকির ভয় তাদের নেই একটুও।

আমাকে কমিশনার বল্লেন পুলিস লরীর উপরে উঠে ছেলেদের বুঝিয়ে বলতে। আমি উঠে জনতার পুরোপুরি আন্দাজ পেলাম—সে যেন বিশাল সমুদ্র আর মানুষ সব যেন ক্ষেপে আছে। আমি কমিশনার সাহেবকে লরীর উপর তুলে দেখালাম—বল্লাম, 'তুমি এদের যে পথে এরা চায় যেতে দাও। যদি বাধা দাও, অমনি বাধায় পারবে না। মেশিনগান্ চালাতে হবে—আর হাজারে হাজারে লোক প্রাণ দেবে হাসতে হাসতে। জালীওয়ানালাবাগের চেয়ে বেশী মানুষ মারতে হবে—তবু এদের হটাতে পারবে না। আর এখন যদি এরা শান্তভাবে চলে যায়, আমি এদের বলে দেব সব রামেশ্বরের মৃতদেহ সৎকারের জন্য কেওড়াতলায় যাবে।' পুলিশ কমিশনার একটু ভেবে দেখবার জন্য নেমে গেলেন। ছেলের দলও তখন ক্ষিপ্তপ্রায়। তারা সব এগিয়ে চল্‌ল। আমি তখন তাদেরই মাঝে পুলিস লরীর উপর। তখন কেন গুলি চালাল না জানি না। চালালে আমার সামনে আমার মাথার উপর দিয়ে চালাতে হত। কমিশনারও মাথা খুব ঠাণ্ডা রেখে কাজ করলেন। পরে রটান হয়, শরৎ বসুই গভর্নরের সেক্রেটারীকে টেলিফোন করে ছেলেদের যাবার ব্যবস্থা করেছিলেন।

সেদিন সকালে, তার আগের দিনের রাত্রে গভর্নরের সঙ্গে আমার আকস্মিক সাক্ষাৎ ও স্টেটসম্যানে ছবি বেরুল—এই দুয়ের বিকৃত টীকা করে তিনি বিবৃতি দিয়েছিলেন যে গভর্নরের সঙ্গে handshake করতে তাঁর ব্যস্ততা নেই—এই রকম স্বাধীনচেতা নেতা যে সেই লাটসাহেবের সেক্রেটারীকে টেলিফোন করে আবার কিছু অনুরোধ করলেন—এও একটা ভাব্‌বার কথা। যাহোক্ আমার নিজের বাহাদুরী নেবার এই ঘটনা সম্পর্কে ইচ্ছা মোটেই ছিল না। ছেলেরা আনন্দে চিৎকার করতে করতে তার আগের দিনের গুলি খাওয়ার তেজ বজায় রাখল।

সেখান থেকে আমি morgue এ চলে এলাম। সেখানে Azizul Haque করোনার খুব ভাল ব্যবহার করেন। রামেশ্বরের বাপ-মাকে তাঁদের আদরের পুত্রকে দেখাবার ব্যবস্থা করলাম। সেই বিকৃত ও ভয়াবহ নগ্ন দেহ দেখে আমারই মাথা কেমন করে উঠল। বাপ-মা দেখার আগে নতুন কাপড় আনালাম। তাঁরা দেখলেন তাঁদের বড় আদরের ধনকে—একটুও বিচলিত হলেন না। অদ্ভুত ধৈর্যশক্তি। শব নিয়ে যাওয়া এক বিরাট ব্যাপার। প্রথমে কথা হয়েছিল লরী করে নিয়ে যাওয়া হবে। পুলিশ একটা লরী দিল—কিন্তু তাতে নেওয়ার কারও মত হল না।

বড় খাট আনার ব্যবস্থা করলাম। ছেলেরাই ঘাড়ে তুলে নিল। আমার মোটরে loudspeaker লাগান ছিল—সেটা খুব কাজে দিল—তার এক পাদানির উপর পচু (উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়) দাঁড়িয়ে ভীড় সামলাতে লাগল। কথা বেশ শোনা গেল—আর লোকেরাও শুনল।

এইভাবে আমরা শবদেহ নিয়ে চললাম। ডালহৌসি স্কোয়ার ঘুরে ছেলের দলও এসে জুটল। তখন আমরা cordon করে procession নিয়ে চলেছি। সে কি বিরাট জনতা। দু'তিন লক্ষ লোক চল্‌ল—কোন চিৎকার নেই, গোলমাল নেই; অতি ধীর শান্তভাবে তাদের শ্রদ্ধা জানিয়ে তারা পথে চলতে থাকল। আমি হাঁটলাম সারাপথ। ছেলেরা ধরল যে ধর্মতলা দিয়ে চৌরঙ্গী যেতে হবে। যদিও route কিছু ঠিক করা ছিল না, ও আমি পুলিশকে বলেছিলাম চৌরঙ্গী দিয়ে যাব না, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ছেলেদের কথা ঠেলতে পারলাম না। কিছু গোলমাল হল না। সব শান্তভাবে চলতে লাগল। চারদিকে লোকে লোকারণ্য—সব বাড়ী থেকে মানুষ যেন ঝুলে পড়ছে—পুষ্পবৃষ্টি করছে, খই ছড়াচ্ছে—সে কি দৃশ্য—ভোলবার নয়।

এদিকে বৈকাল থেকে শহরের দক্ষিণ অঞ্চলে খুব গোলমাল শুরু হয়েছে। সেদিন ত চারদিকে হরতাল—হিন্দু-মুসলমান সব একজোট। আমাদের procession-এর মধ্যেই হাজার হাজার মুসলমান চলছিল। তার আগের দিনে যারা ইংরেজের গুলি খেয়েছিল তাদের মধ্যে মুসলমানও ছিল। সে এক অপূর্ব দৃশ্য। যা হোক দক্ষিণ কলকাতায়ও হরতাল। কারও কোন গাড়ী যেতে দেবে না। আমার গাড়ী দুবার আটকাতে এসেছিল; তারপর আমাকে দেখে ছেড়ে দিল। কংগ্রেস, হিন্দুসভার Flag দেখলে গাড়ী ছেড়ে দিচ্ছিল। Processionএ সব Flag-ই উড়ছিল। এ আমি ইচ্ছা করেই ব্যবস্থা করে দিয়েছিলাম। একদিনের জন্যও আমরা দেখাই যে সব Flag এক হয়ে যেতে পারে ও সম্মিলিত ভাবে আমরা কোন বৃহৎ ব্যাপারে একবদ্ধ হতে পারি।

দক্ষিণ কলকাতায় এক মিলিটারী লরী একটি ছেলেকে চাপা দিয়ে মেরে ফেলে। জনতা বিক্ষুব্ধ হয়ে সেই লরীকে আটকায় এবং লরীচালক এক নিগ্রোকে ধরে নিয়ে পুড়ন্ত লরীর মধ্যে নিক্ষেপ করে। তার পরই আগুন জ্বলল। এদিকে গাড়ী পুড়তে শুরু করল। মিলিটারীরা আপত্তি না করে গাড়ী ছেড়ে চলে যেতে লাগল। আর অন্যদিকে পুলিশ এসে গুলী চালাতে আরম্ভ করল। কারণে-অকারণে গুলি চালিয়ে কত লোকের প্রাণ গেল—লোক জখম হল। এ সব খবর আমি বৈকালে পাইনি। পথে আসতে আসতে শুনলাম। এই খবর পেয়ে আমাকে হেঁটে আসতে হল—দায়িত্ব ছিল আমার উপর, আমি সেজন্য সরে যেতে পারলাম না। Calcutta Clubএ আসার আগে দেখলাম দূরে আগুন জ্বলছে মাঝে মাঝে। শুনলাম সব লরী পুড়ছে। আমি তখন procession ঘুরিয়ে দিলাম হরিশ মুখুজ্জে রোড দিয়ে।

সেখানেও একই ব্যাপার—রামেশ্বরের বাড়ী কালীঘাটের কাছে হরিশ মুখুজ্জে রোডে আগুনের খেলার পাশ দিয়ে কোন রকমে আমরা কেওড়াতলায় এসে পৌঁছলাম। তখন আমার পা আর চলে না— পায়ের তলায় ফোস্কা পড়ে গেছে—আর দুদিনের এই খাটুনিতে শরীর যেন আর স্থির রাখতে পারছিলাম না। শ্মশানে লোক সব উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের সব

ব্যবস্থা করতে বলে আমি বাইরে ঘাটের কাছে বসলাম। বায়স্কোপের ছবির মত সব ঘটনা মনে আসছিল। অনেকে সেখানে এলেন। শরৎ বসু আসেন নি—পরে বেশী রাতে এসেছিলেন।

আগুন জ্বলার খানিক পরে প্রায় রাত ১১টায় আমি বাড়ীর দিকে চল্লাম। যাবার পথে আর এক ভদ্রলোক তাঁর একমাত্র সন্তানকে হাজরা পার্কের কাছে পুলিসের গুলিতে হারিয়েছেন, তাঁর বাড়ীতে গেলাম। তখন মৃতদেহ কোলে নিয়ে ছেলের মা বসে আছেন। বাপ পাগলের মত ঘুরছেন। সেখানেও দেখলাম অদ্ভুত ধৈর্য। দুঃখ নেই, চোখে জল নেই। ছেলে আমার ইংরেজের গুলিতে প্রাণ দিয়েছে—রাতটা আমার বুকে থাকুক, কাল সকালে একে নিয়ে যাবেন—এই অশিক্ষিতা, সাধারণ বাঙালী ভদ্র পরিবারের মায়ের কথা। এই দেখে আমি বুঝলাম দেশ কতটা এগিয়ে গেছে—ও বিপ্লব আগত প্রায়। এখন শুধু এই ভীতিশূন্য চিন্তাধারাকে শৃঙ্খলার মধ্যে এনে একে ঠিকপথে চালিত করতে পারলে ইংরেজ আর কদিন এদেশে থাকতে পারে!

শুনলাম যে খানিক আগে জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলী, যিনি তার আগের রাত্রে তিনটা অবধি আমার সঙ্গে ছিলেন ও পাগলের মত ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন—তাঁর মোটরের সঙ্গে এক মিলিটারী লরীর ধাক্কা লেগেছে ও তাঁর ড্রাইভার তখনই মারা গেছে। তিনিও খুব সাংঘাতিকভাবে জখম হয়ে হাসপাতালে খানিক থেকে মারা গেলেন। খবর শুনে যেন সব ভেল্কীবাজী মনে হতে লাগল। এই আছে এই নেই, লাঠি, গুলি, মোটর লরী—সবই যেন বিধাতার খেলা চলেছে! বাড়ী এসে রাত ১২টায় শুলাম অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে, অথচ তার পরদিনই ভোরে ইলেক্‌শনের ব্যাপারে মোটরে কাঁচড়াপাড়া থেকে আরম্ভ করে বারাকপুর পর্যন্ত ঘোরার কথা। (শ্যামাপ্রসাদের ডায়েরী)

বৃটিশ-মন্ত্রিমিশনে

১৯৪৬ সালে বৃটিশ-মন্ত্রিমিশনের আমন্ত্রণে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ তাদের সহিত সাক্ষাৎ করেন। ইতিমধ্যে মিঃ জিন্না প্রকাশ্যে পাকিস্তানের দাবী জানান। প্রদেশ-সমূহের বিন্যাসের ভিত্তিতে এক মীমাংসার প্রস্তাব হয়। ডঃ শ্যামাপ্রসাদ প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভার ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম প্রতিবাদ জানান, যেহেতু এই প্রস্তাবে দেশভাগ ও পাকিস্তান দাবীকেই প্রকারান্তরে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। ফলে মন্ত্রিমিশনের প্রস্তাব হিন্দুদের কাছে মোটেই গ্রহণীয় না হওয়ায় প্রত্যাখ্যাত হল।

১৯৪৬-এর শেষ দিকে যখন ভারতের সংবিধান সভা গঠিত হল তখন শ্যামাপ্রসাদ বাংলা থেকে তার সদস্য নির্বাচিত হলেন। তার আগে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্র থেকে বঙ্গীয় আইন সভার সদস্য নির্বাচিত হন। তাঁর প্রখর বুদ্ধি ও আন্তরিকতা, সাংসদ হিসাবে তাঁর পারদর্শিতা এবং সর্বোপরি কর্তব্যের প্রতি দায়িত্ববোধ ও গভীর নিষ্ঠা অচিরেই তাঁকে এক উদীয়মান নেতা রূপে চিহ্নিত করে দিল এবং সংবিধান সভায় তিনি সকলের শ্রদ্ধাভাজন হয়ে উঠলেন। তখন থেকেই তিনি এক জাতীয় নেতা রূপে স্বীকৃতিলাভ করতে শুরু করলেন।

অষ্টম অধ্যায়

১৯৪৬-১৬ আগস্ট ঃ প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ঃ প্রস্তুতি ও প্রয়োগ

প্রত্যক্ষ সংগ্রাম বা Direct Action বস্তুটা কি, এই দুটি কুখ্যাত শব্দ ভারতীয় রাজনীতিতে কি বিপর্যয় ঘটিয়েছিল, সে সম্পর্কে অনেকেরই স্পষ্ট ধারনা নেই। বিশেষত বর্তমান প্রজন্মকে সেই বিষয়ে অন্ধকারে রাখার একটা সযত্ন প্রয়াস দেখা যায় সর্বক্ষেত্রে। কিন্তু উপমহাদেশের মুসলিম রাজনীতির অতীত ইতিহাস এবং রাজনীতিতে কসাইবৃত্তির আমদানিকারকদের ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে নতুন প্রজন্মেরও ওয়াকিবহাল থাকা বাঞ্ছনীয় মনে করে যৎসামান্য তথ্য দেওয়া গেল নমুনা হিসাবে।

শুধু 'মুখেন মারিতং জগৎ' বলে লুঙ্গি খিঁচে খালি হাতে মাঠে নামলেই তো হয় না। হরতাল সফল করতে, হিন্দুদের আত্মারাম খাঁচা ছাড়া করতে, হাতে তো হাতিয়ার থাকা একান্ত আবশ্যক। তাই ১৬ই আগস্টের কয়দিন আগে দেখা গেল—বাইরে থেকে পরিকল্পিত ভাবে অস্ত্র ও গুণ্ডাবাহিনী আমদানি হচ্ছে কলকাতায় ঃ

1. Influx of large number of Muslims from outside into Kalabagan and other dangerous areas just before 16th.

(বাইরে থেকে প্রচুর সংখ্যক মুসলমান আমদানি করা হয়েছিল)।

2. Sharpening of weapons before 16th in various places. viz. Belgachia Rajabazar, Kalabagan bustee, Canal West Road, Park Circus, Entally, Dharmatolla etc.

(বেলগাছিয়া, রাজাবাজার, কলাবাগান বস্তি, ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, ধর্মতলা, পার্কসার্কাস, এন্টালি প্রভৃতি এলাকায় কিছুদিন ধরে মুসলমানদের অস্ত্রে শান দিতে দেখা গিয়েছে।)

3. একই রকম সাইজের ছোরা বিভিন্ন স্থানে পাওয়া গেছে। (Daggers of uniform size)

4. বি. টি. রোডে লাঠি, ছোরা ও তরোয়াল ভর্তি লরি দেখা গেছে।

5. মানিকতলায় ক্যানাল ওয়েস্ট রোডে অস্ত্রশস্ত্র ভর্তি ঠেলাগাড়ি দেখা গেছে। Sharpening of daggers went on the night of 15th.

6. হত্যাকাণ্ডে কসাইখানার কসাইদের সক্রিয় ভূমিকায় লাগান হয়েছে।

7. In Rajabazar boys were found sharpening weapons.

8. In Lalabagan bustee found sharpening daggers and knives on 15th.

9. A number of houses in Dharamtolla St. were reserved for goondas.

10. On a search in Belgachia area a large number of swords, Iathis and daggers were recovered (after the riot).

11. In Kidderpore area a large number of swords and daggers were recovered. (after the riot)

12. Muslim shops were marked 'Pakistan'.

13. League people in the lorry used swords, knives, daggers and lathis.

14. Instruction had been issued to several Muslim hostels to make preparation to set fire to tram cars and military lorries on the 16th.

15. During 16th-18th or 19th August, Muslim lorries with lathis and weapons and brickbats were found in Barrackpur Trunk Road. Weapons were stored in 8, Zakaria Street and Nakhoda Mosque.

16. All the railings which were surrounding the Ripon Square had been uprooted and turned into sharp weapons.

17. বেলগাছিয়ায় লাঠি ও তরোয়াল বহনকারী লরিসমূহ দেখা গেছে।

Muslim goondas found sharpening weapons on 15th in Belgachia.

18. ১৬ তারিখ এব পরে মুসলমানরা বিরাট সংখ্যক লরি কাজে লাগিয়েছিল।

19. এ সমস্ত লরির ন্য কলকাতার মেয়র ওসমান, প্রধানমন্ত্রী সুরাবর্দী প্রমুখ পেট্রোলের ঢালাও কুপন ইস্যু করে—বিশেযত ১৫ থেকে ১৮ আগস্ট পর্যন্ত। তখন পেট্রোলের ভীষণ অনটন চলছিল।

20. মুসলমান গুণ্ডাদের পরিবহণ ও লুটপাটের কাজে এসব লরি ব্যবহৃত হয়।

21. কলকাতার মেয়র হিসাবে ওসমান কর্পোরেশনের লরি ব্যবহারের ঢালাও ব্যবস্থা করে। মুসলমান গুণ্ডারা সেসব লরি চেপে মনের সুখে লুটপাট, অগ্নিসংযোগ ও হত্যাকাণ্ড চালিয়ে যায়।

22. মুসলিম লীগ সরকারের চাউল সংগ্রহের অন্যতম এজেন্ট ইস্পাহানি তার ব্যবসায়ে নিযুক্ত লরিগুলি মুসলিম লীগ ভলান্টিয়ারদের ব্যবহারের জন্য দেয়। মুসলিম লীগের পতাকা খাটিয়ে এসব লরি বৌবাজার ও সেন্ট্রাল এভিনিউ-র পেট্রোল পাম্প থেকে জোরপূর্বক পেট্রোল আদায় করে।

একদিকে যেমন অস্ত্রশস্ত্র মজুত করা হল, অপর দিকে লুটপাটের সুবিধার জন্য গাড়ির ব্যবস্থা হল। কলকাতার গুণ্ডাবাহিনী ছাড়াও বাইরে থেকে গুণ্ডাশ্রেণীর লোক আমদানি করা হল। অস্ত্রশস্ত্র ও লোক জড়ো হবার পর এবার কলতকাতার মহল্লায় মহল্লায় ১৫ই আগস্ট রাত্রিবেলা তাদের ছড়িয়ে দেওয়া হল। হিন্দুরা যখন গভীর নিদ্রাচ্ছন্ন, তখন কলকাতার মসজিদগুলিতে কেমন সাজ সাজ রব পড়েছিল, তার বিবরণ মেলে উপরোক্ত পুলিশ রিপোর্ট থেকে।

এবার ঝাঁপিয়ে পড়োঃ ঘুম চোখে হিন্দুদের সামনে মৃত্যুদূত

১৬ই আগস্ট মুসলিম লীগ ডাকল হরতাল। সুরাবর্দীর লীগ গভর্নমেন্ট ঘোষণা করল সরকারী ছুটি। উদ্দেশ্য সরকারী ও বেসরকারী মুসলমান জনতা যাতে নিজ নিজ এলাকায় সঙ্ঘবদ্ধ থেকে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অংশগ্রহণ করতে পারে। যেমন—বেলগাছিয়া মুসলমান

বস্তিকে কেন্দ্র করে বেলগাছিয়া অঞ্চল বিধ্বস্ত করা। রাজাবাজার অঞ্চলের মুসলমানদের জন্য নির্দিষ্ট হল মানিকতলা থেকে শিয়ালদহ-বৌবাজার-কলেজ স্ট্রীট এলাকা। কলাবাগান বস্তির মুসলমানরা ভার পেল হ্যারিসন রোড-বড়বাজার-ঠনঠনিয়া, মার্কাস স্কোয়ার-ফলপট্টি অঞ্চল। কলুটোলা, জ্যাকেরিয়া স্ট্রীট, নাখোদা মসজিদ, টেরিটি বাজার, ফিয়ার্স লেনের গুণ্ডাদের হাতে ছেড়ে দেওয়া হল লালবাজার থেকে চিৎপুর হয়ে ক্যানিং স্ট্রীট-এজরা স্ট্রীট অঞ্চল। ধর্মতলা, তালতলা-ওয়েলেসলি হয়ে পার্ক সার্কাসের দিকে এগিয়ে গেল এক দল। ওদিকে এন্টালি থেকে শুরু করে বেলেঘাটা সমেত সমগ্র পূর্ব কলকাতা ঘিরে বালিগঞ্জের কাছাকাছি পর্যন্ত আর এক দলের শিকারক্ষেত্র নির্দিষ্ট হয়েছিল। আর খিদিরপুর-ওয়াটগঞ্জ-মেটিয়াবুরুজের ভার পেল পোর্ট ও ঐ এলাকার গুণ্ডারা।

১৬ই তারিখে ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতেই উপরিউক্ত বিস্তীর্ণ এলাকার অপ্রস্তুত ও অসাবধান হিন্দুদের উপর আচমকা ঝাঁপিয়ে পড়ল মুসলিম লীগ গুণ্ডাবাহিনী। লুটপাট, খুন-জখম, ধর্ষণ ও অগ্নিসংযোগে মেতে উঠল সরকারী মদতপুষ্ট মুসলিম লীগ ক্যাডার ও জনতা। বড়বাজার এলাকায় তাদের শিকার মাড়োয়ারী ব্যবসায়ী শ্রেণী; অন্যত্র বাঙালী হিন্দুরা। সেদিন সকাল থেকে লালবাজার পুলিশ কন্ট্রোল রুমে বসে সুরাবর্দী, ওসমান, লালমিয়া, সেরিফ খান প্রমুখ মুসলিম লীগ নেতা ও মহল্লা সর্দাররা (area commanders) দাঙ্গা পরিচালনা করে।

কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় জমে উঠল লাশের পাহাড়। ফিয়ার্স লেন এলাকার গুণ্ডাদের আক্রমণে টেরিটি বাজার এলাকার ভাটিয়া ও দোসাদরা নির্বিচারে নিহত হল। লালবাজার থেকে ১০০ গজের মধ্যে অবস্থিত টেরিটি বাজারের ঘটনা দু'দিনের মধ্যেও পুলিশ জানতে পারেনি। শেষে পচাগলা মৃতদেহের দুর্গন্ধ লালবাজারের কন্ট্রোল রুমে গিয়ে ঢুকলে তাদের টনক নড়ে।

ঘণ্টায় ঘণ্টায় খুনজখমের রিপোর্ট

তিন সপ্তাহ ধরে পরিকল্পনা মাফিক প্রস্তুতিপর্ব শেষ হতেই অনুষ্ঠানসূচী শুরু হল বিস্মিল্লাহ বলে ঃ

1. Stabbing commenced at 4-30 a.m

2. Between 6-30 and 7-30 large number of armed Muslims attacked Manicktola Bazar. Two Hindu ladies attacked. One Hindu gentleman stabbed to death.

তারপর মিনিটে মিনিটে লালবাজার পুলিশ হেড কোয়াটার্স যে খুন-জখম লুটপাট ও অগ্নিসংযোগের খবর আসতে থাকে তার কিঞ্চিৎ বিবরণ—

7-00– মানিকতলায় দাঙ্গা শুরু হয়েছে।

7-30–Sergent E. Williams of Lalbazar Telephone office reported that he was escorting lady operators in a police truck along Central Avenue and the same lorry was obstructed by Muslim youths.

7-35– বৌবাজার ও লোয়ার সার্কুলার রোডের সংযোগ স্থলে (শিয়ালদহ) বিরাট সংখ্যক

মুসলমান লাঠি ও লোহার রড হাতে জমায়েত হয়েছে।

8-25– টেরিটি বাজারে দাঙ্গা চলছে।

8-30– লোয়ার চিৎপুরে সিটি সিনেমার কাছে দাঙ্গা শুরু হয়েছে।

8-32– লোয়ার চিৎপুর রোডে দাঙ্গা চলছে।

9-00– শিয়ালদহ অঞ্চলে ভয়াবহ অবস্থা।

9-05– ওয়ার্ডস্ ইনস্টিউশন স্ট্রীটে দাঙ্গা চলছে।

9-12– রিপন স্ট্রীট, ওয়েলেসলি স্ট্রীট, মল্লিকবাজারে ছুরিকাঘাত চলছে।

9-15– উত্তরে শ্যামবাজার ও দক্ষিণে ওয়াটগঞ্জ সব জায়গা থেকে দাঙ্গা-হাঙ্গামার খবর আসছে।

9-30– বড়তলা থানা মুসলমানদের দ্বারা আক্রান্ত। থানা থেকে সশস্ত্র পুলিশের সাহায্য চাওয়া হয়েছে লালবাজারের কাছে।

9-55– বড়তলা থানা থেকে আবার সাহায্যের জন্য অনুরোধ।

10-10– দমদম রোডে কয়েক হাজার হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গায় লিপ্ত। মুসলমানরা গুলি বর্ষণ শুরু করেছে।

10-12– গড়পার, যোগীপাড়া লেন অর্থাৎ ক্যানাল অঞ্চলে গোলমাল চলছে।

10-30– হ্যারিসন রোডে গোলমাল। রিপন কলেজের সামনে দু'পক্ষে লড়াই চলছে।

10-08– স্পেশিয়াল ব্রাঞ্চ অফিসার জানাচ্ছেন ২১২, বিবেকানন্দ রোডে কমলা বস্ত্রালয়ে আগুন লাগান হয়েছে।

10-05– রিপন কলেজের সামনে সাংঘাতিক দাঙ্গা চলছে।

10-50– মুসলমানদের এক বিরাট শোভাযাত্রা শিয়ালদহের দিক থেকে দোকানপাট লুট করতে করতে বৌবাজারের দিকে আগুয়ান। আর একটি শোভাযাত্রা হিন্দু-বিরোধী ধ্বনি দিতে দিতে এবং দোকানপাট লুট করতে করতে আপার সার্কুলার রোড ধরে ময়দানের দিকে এগিয়ে চলেছে। লাঠি ও উন্মুক্ত অসি হস্তে একটি শোভাযাত্রা শ্যামবাজার থেকে হাতিবাগান পর্যন্ত এগিয়ে এসেছে।

1-30– মুসলমান এলাকার নিকটবর্তী ষষ্ঠীতলায় হিন্দুদের ঘরবাড়িতে অগ্নিসংযোগ; নারকেলডাঙ্গা মেইন রোডের কাছে পাঁচটি মৃতদেহ।

3-00– গড়পার এলাকায় ভয়ানক হত্যাকাণ্ড শুরু হয়েছে। খালের পশ্চিমপাড়ে হিন্দুদের পাইকারি হারে হত্যা করা হচ্ছে। ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

ময়দানে মনুমেন্টের নিচে বিশাল মুসলিম জমায়েত। তাদের মধ্যে বিরাট সংখ্যক গুণ্ডার উপস্থিতি। তারা মিটিং থেকে সটকে পড়ে এবং মিটিং না ভাঙতেই হিন্দুদের দোকানপাট লুট ও পোড়াতে থাকে। (মিলিটারী রিপোর্ট)।

4-05–লাইট হাউস সিনেমার পার্শ্ববর্তী সমস্ত দোকান ভাঙ্গা ও লুটপাট চলছে।

4-20–মুসলিম জনতা বেঙ্গল ক্লাব আক্রমণ করেছে।

4-30–মেট্রো সিনেমার পাশে কে. সি. বিশ্বাসের বন্দুকের দোকান ভেঙ্গে মুসলিম জনতা অস্ত্রশস্ত্র লুট করে নিয়েছে। ঐ অঞ্চলে আরো লুটপাটের খবর।

4-42–ধর্মতলা স্ট্রীটে বিখ্যাত 'কমলালয় স্টোর্স' লুটপাট হয়ে গেছে।

5-10–আশপাশের রাস্তায় নৃশংস হত্যা ও লুণ্ঠন চলছে। ধর্মতলা স্ট্রীটে চাঁদনীচক বাজার মুসলমান গুণ্ডাদের দ্বারা লুণ্ঠিত। ইন্দ্র রায় রোডের বস্তি থেকে সশস্ত্র মুসলিম গুণ্ডার দল বেরিয়ে আসছে।

মির্জাপুর স্ট্রীটে ও আপার সার্কুলার রোডের সংযোগস্থলে সশস্ত্র ও উত্তেজিত মুসলিম জনতায় পরিপূর্ণ।

ওয়েলেসলী স্ট্রীটে বাটা সু কোম্পানী ও সেন এন্ড ল'র দোকান লুণ্ঠিত। ৮ নং তারাচাঁদ দত্ত স্ট্রীটে গমের কলে হিন্দুদের খুন করা হয়েছে।

১৫২ নং লোয়ার সার্কুলার রোডে লক্ষ্মীকান্ত দাসের সাইকেল দোকান লুণ্ঠিত ও ভস্মীভূত। রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীটের হিন্দুদের প্রায় সমস্ত বসতবাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে।

ক্যানিং স্ট্রীটে হত্যা ও লুণ্ঠন

At 55, Canning St. an aluminium shop was looted, saw several hundred people going away with various articles looted from shops of Hindus. Picked up 6 dead and 7 injured persons, mostly Hindus from Canning St. area.

ওয়েলেসলী এলাকায় লুটতরাজ

Marquis St, Elliot Rd, Royd St. are all badly affected areas

Mass looting by Muslim crowd continued on Corporation St, and Wellesly St.

ধর্মতলায় ধ্বংসলীলা

Khan Sahib Khalilur Rahman, D. C. North, reports "chaos and disorders going on in Dhurrumtolla St. Wellesly St, Market St, Corporation St. and Free School St. Local Police had been simply overpowered. Shops are being looted and murders and assaults are being continued. It is difficult to control the situation unless military is requisitioned."

সরকার ও কর্পোরেশন থেকে দাঙ্গায় সহায়তা ঃ মুসলমান ব্যবসায়ীদের গুণ্ডাদের দরাজ হাতে সাহায্য

On 16th and dates thereafter, a large number of lorries and private cars brought into service by the Muslims.

Mr. Osman, Mayor of Calcutta, Minister, and the Chief Minister issued special coupons for Muslim League goondas for work form 15th - 18th. A very large number of this coupons issued in the name of Mr. H. S. Suhrawarby, used for the purpose of obtain petrol dudring 15th-18th these lorries used for the purpose of looting and carrying Muslim League Volunteers মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

নবম অধ্যায়

কলকাতার পর নোয়াখালি ঃ প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ফলশ্রুতি ঃ দেশভাগ ও বাংলা ভাগ

১৬ আগষ্ট ১৯৪৬ -এ মুসলিম লীগ প্রত্যক্ষ সংগ্রাম (Direct Action) শুরু করল এবং কলকাতায় ও দেশের কয়েকটি নির্দিষ্ট এলাকায় বিপুল সংখ্যায় হিন্দুদের সংহার শুরু করা হল, যাতে কংগ্রেস নেতারা মাথা নত করতে বাধ্য হন। এই মহাসংকটের সময়ে শ্যামাপ্রসাদ জনগণের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন এবং আত্মরক্ষার জন্যে তাদের উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করেছিলেন। মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভার সমর্থনপুষ্ট মুসলিম গুণ্ডাদের সংঘবদ্ধ আক্রমণের বিরুদ্ধে আক্রান্ত জনসাধারণ উল্লেখযোগ্য প্রতিরোধের পরিচয় দিয়েছিল।

১৯৪৬ সালের নির্বাচনে মুসলীম লীগ একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী হয়ে এইচ. এস. সুরাবর্দীর নেতৃত্বে মন্ত্রীসভা গঠন করল। বাংলার রাষ্ট্রতন্ত্র ও মুসলমান সমাজ পুরোপুরি মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের কবলস্থ হল এবং অনতিবিলম্বে তা ছোবল মারল সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপর। সোনার বাংলার বুকে শুরু হল ছোরা-মারা রাজনীতি। লক্ষ্য, বাংলার হিন্দু সম্প্রদায়। বিসমিল্লাহ্ বলে তার প্রথম ছোবল কলকাতার বুকে -১৬ আগষ্ট ১৯৪৬। আর দ্বিতীয় ছোবল সুদূর নোয়াখালীর শ্যামল কোমল অঙ্গে প্রায় দুই মাস পর-১০ অক্টোবর।

১৯৪৬ সালের ১০ই অক্টোবর কোজাগরী লক্ষ্মী পূর্ণিমার দিন। ১৬ই আগষ্ট কলকাতার দাঙ্গাহাঙ্গামার পর নোয়াখালীতে লীগকর্মী গোলাম সরওয়ার ও তার সহযোগীরা হিন্দুদের বিরুদ্ধে ক্রমাগত বিষোদ্গার শুরু করল। ফলে নোয়াখালীর সাম্প্রদায়িক আবহাওয়া অতিমাত্রায় বিষাক্ত হয়ে উঠল।

আকাশে বাতাসে মৃত্যুর করাল ছায়া পড়েছে। হঠাৎ আকাশ বাতাস প্রকম্পিত করে—আল্লা হো আকবর, পাকিস্তান জিন্দাবাদ, নারায়ে তকদির, লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান, মারকে লেঙ্গে পাকিস্তান, মালাউনের রক্ত চাই ---ইত্যাদি ভীতিপ্রদ ও আক্রমণাত্মক ধ্বনি উঠল। ভীত সন্ত্রস্ত ও অত্যন্ত সংখ্যালঘু হিন্দুরা নিজ নিজ গৃহে নীরবে আশ্রয় গ্রহণ করল। ভারতের এক প্রান্তে অবস্থিত এক ক্ষুদ্র অখ্যাত জেলায় লীগের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নায়ক মহম্মদ আলী জিন্নার পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার হিংসাত্মক সংগ্রাম। সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত ও নিরস্ত্র সংখ্যালঘিষ্ঠদের উপর সংখ্যাগরিষ্ঠদের আকস্মিক ও অমানুষিক অত্যাচার, উৎপীড়ন---বীভৎস হত্যাকাণ্ড, গৃহদাহ, লুঠতরাজ, নারীহরণ ও জোরপূর্বক ধর্মান্তরিত করণ। রাস্তাঘাট কেটে ফেলা হয়েছে, সাঁকো পুল ভেঙ্গে দিয়েছে, চারদিক জলে জলাকার। একমাত্র যানবাহন নৌকার মাঝিমাল্লারা সবাই মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত। সবচেয়ে নিকটবর্তী রেলস্টেশনের দূরত্ব পনের থেকে বিশ মাইল। পালাবার পথ নেই। পথঘাট লীগের স্বেচ্ছাসেবকগণ কর্তৃক অবরুদ্ধ [illegible] নোয়াখালী

জেলার রামগঞ্জ, বেগমগঞ্জ, লক্ষ্মীপুর, রায়পুর, সেনবাগ, সন্দ্বীপ থানা ও পার্শ্ববর্তী ত্রিপুরা জেলার চাঁদপুর, চৌদ্দগ্রাম, ফরিদগঞ্জ, লাকসাম, হাজিগঞ্জ, বুড়িচঙ্, কচুয়া, ও দেবীদ্বার থানার কিয়দংশে বসবাসকারী হিন্দুদের উপর এক তরফা আক্রমণ। নোয়াখালী করপাড়া, নারায়ণ পুর, সায়েস্তানগর, গোপাইরবাগ, নোয়াখালি, গোবিন্দপুর, নন্দীগ্রাম, দালালবাজার, পাঁচগাঁও, সাহাপুর প্রভৃতি স্থানে অনুষ্ঠিত অমানুষিক বর্বরতা মানব সভ্যতার কলঙ্করূপেই চিরদিন নির্দিষ্ট থাকবে; সে সঙ্গে নোয়াখালীর চিরস্থায়ী কলঙ্ক বিশ্ব-ইতিহাসের পাতায়। দাঙ্গাহাঙ্গামার অব্যবহিত পরেই যে সব জননেতা নোয়াখালী ছুটে এলেন এবং দাঙ্গা বিধ্বস্ত এলাকা পরিদর্শনান্তে এই লোমহর্ষক ঘটনার বিবরণসহ সংবাদপত্রে বিবৃতি দিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, আচার্য জে. বি. কৃপালনী, শ্রীমতী সুচেতা কৃপালনী শরৎচন্দ্র বসু, সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ, মিস্ মুরিয়েল লিস্টার, এ. ভি. ঠক্কব। প্রমুখ। এঁদের মধ্যে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের বিবৃতিটি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক ও সময়োপযোগী বলে উদ্ধৃত হল।

"ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের বিবৃতি

ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় নোয়াখালি ও ত্রিপুরা জেলার উপদ্রুত অঞ্চলে সফর করিয়া আসিয়া এক বিবৃতিতে বলেন যে, "নোয়াখালি ও ত্রিপুরা জেলায় উপদ্রুত অঞ্চলের ঘটনাবলীর মধ্যে এমন একটি বৈশিষ্ট্য আছে, যাহা ভারতবর্ষের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ইতিহাসে অভূতপূর্ব। অবশ্য ইহাকে কোনক্রমেই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বলা চলে না। ইহা সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের উপর সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের সঙ্ঘবদ্ধ ও সুপরিকল্পিত আক্রমণ। এই আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য ছিল ব্যাপকভাবে ধর্মান্তাকরণ এবং লুণ্ঠন, গৃহদাহ এবং সমস্ত বিগ্রহ ও দেবমন্দির অপবিত্রকরণ। কোন শ্রেণীর লোককেই রেহাই দেওয়া হয় নাই। অপেক্ষাকৃত ধনীদের বিরুদ্ধে অত্যাচারের মাত্রা আরও কঠোর হয়। হত্যাকাণ্ডও পরিকল্পনার অঙ্গ ছিল; কিন্তু যাঁহারা অত্যন্ত প্রভাবশালী এবং যাঁহারা প্রতিরোধ করেন, প্রধানতঃ তাঁহাদের জন্যই এই ব্যবস্থা ছিল। নারীহরণ, ধর্ষণ এবং বলপূর্বক বিবাহও এই সকল কুকার্যের অঙ্গ ছিল। কিন্তু এই প্রকার নারীর সংখ্যা কত, তাহা সহজে স্থির করা সম্ভব নহে। যে সকল ধ্বনি উচ্চারিত হয় এবং যে সকল কার্যপদ্ধতি অবলম্বিত হইয়াছিল তাহাতে দেখা যায় যে, এ সমস্তই সমূলে হিন্দু-লোপ ও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার একটি পরিকল্পনার অন্তর্গত ছিল। মুসলিম লীগের জন্য এবং ধর্মান্তকরণ অনুষ্ঠানের ব্যয় ইত্যাদি অন্যান্য কারণে চাঁদা চাওয়া হইয়াছিল। ইহা হইতে দেখা যায় যে, আক্রমণকারিগণ ও তাহাদের দলপতিরা মুসলিম লীগের আদর্শে উদ্বুদ্ধ ছিল। তাহা ছাড়া তাহারা আরও জানিত যে প্রদেশে তাহাদের নিজেদের গভর্নমেণ্ট রহিয়াছে এবং তাহাদের স্ব-সম্প্রদায়ভুক্ত স্থানীয় রাজকর্মচারীরাও সাধারণতঃ তাহাদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন। এই প্রকার ধারণার বশবর্তী হইয়া কুকার্যে তাহাদের সাহস আরও বাড়িয়া যায়।

এই সকল কুকীর্তির নায়ক একদল গুণ্ডা ছিল অথবা তাহাদের অধিকাংশই বাহির হইতে আসিয়াছিল—এরূপ বলিলে মিথ্যা বলা হইবে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্থানীয় লোকেরা এইসব পৈশাচিক কাণ্ড করে এবং সাধারণভাবে এই সকল কার্যের প্রতি লোকের সহানুভূতি ছিল। কয়েক ক্ষেত্রে মুসলমানরা লোকের প্রাণ বাঁচাতে সাহায্য করিয়াছে; কিন্তু তাহাদের সংখ্যা অতি নগণ্য। এভাবে যাহাদের জীবন রক্ষা পায়, তাহারা পলায়নে অসমর্থ হইলে তাহাদিগকে ধর্মান্তরিত হইয়া গ্রামে থাকিতে হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে এবং তাহাদের ধনসম্পত্তিও লুণ্ঠন হইতে রক্ষা পায় নাই। ভাবী বিপদের আশঙ্কা পূর্বাহ্নেই কর্তৃপক্ষের গোচরে আনা হইয়াছিল। কিন্তু যাহারা দিনের পর দিন বিদ্বেষ ও হিংসা প্রচার করিতেছিল, সেই সব প্রকাশ্য প্ররোচকদের কার্যকলাপ বন্ধ করিতে তাঁহারা চেষ্টা করেন নাই। যখন সত্যসত্যই হাঙ্গামা বাধিয়া উঠিল এবং কয়েকদিন যাবৎ চলিতে লাগিল, কর্তৃপক্ষ তখন লোকের ধনপ্রাণ রক্ষা করিতে অপারগ হইলেন। এই অক্ষমতা দ্বারা তাঁহারা নিজেরাই নিজেদের নিকট ধিকৃত হইয়াছেন এবং স্ব স্ব পদে বহাল থাকা সম্বন্ধে অযোগ্যতার প্রমাণ দিয়াছেন। বস্তুতঃ তাঁহারা যতক্ষণ উপস্থিত থাকিবেন, ততক্ষণ স্বাভাবিক অবস্থা ফিরাইয়া আনা সহজ হইবে না। এই প্রকার একটা অঘটন ঘটিয়া যাইবার পরও নোয়াখালিতে মাত্র প্রায় ৫০ জনকে এবং ত্রিপুরায় জনকতককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

সহস্র সহস্র লোক বিপজ্জনক এলাকার অন্তঃস্থল হইতে পলাইয়া গিয়া অত্যাচারীদের নাগালের ঠিক বাহিরে জেলার ভিতরেই আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। তাহাদের অবস্থা সহজেই অনুমেয়। যে সকল স্থান এখনও উপদ্রুত হয় নাই, সেই সকল স্থান হইতেও অধিবাসীরা হাজারে হাজারে পলাইয়া আসিয়া আশ্রয়-কেন্দ্রগুলিতে আশ্রয় লইয়াছে। কুমিল্লা, চাঁদপুর, আগরতলা ইত্যাদি স্থানে আশ্রয়কেন্দ্র খোলা হইয়াছে। সর্বশ্রেণীর স্ত্রী-পুরুষ শিশুসহ এই সকল আশ্রয়-কেন্দ্রে আশ্রিতের সংখ্যা ৫০ হাজার হইতে ৭৫ হাজার হইবে।

এই সকল লোক ছাড়া আরও প্রায় ৫০ হাজার বা ততোধিক লোক এখনও বিপজ্জনক এলাকায় রহিয়াছে। এই এলাকাকে বেওয়ারিশ এলাকা বলা যাইতে পারে। এই এলাকায় অবরুদ্ধ ব্যক্তিদিগকে একদিনও বিলম্ব না করিয়া উদ্ধার করিতে হইবে। তাহাদের সকলকেই ধর্মান্তরিত করা হইয়াছে এবং তাহারা এখনও অত্যাচারীদের হাতের মুঠোর ভিতরে। তাহারা এখন নামেমাত্র মানুষ। তাহাদের আধ্যাত্মিক মৃত্যু ঘটিয়াছে। তাহাদের অধিকাংশই সর্বস্বান্ত। এবং তাহাদের শরীর, মন দুই-ই ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। তাহাদের মধ্যে তপসিলী বা অন্যান্য শ্রেণী-নির্বিশেষে সমস্ত শ্রেণীর হিন্দু আছে। তাহাদের উপর যে অপমান ও নির্যাতন চলিয়াছে, তাহার সীমা নাই। তাহাদের নাম পরিবর্তন করা হইয়াছে, তাহাদের স্ত্রীলোকেরা অপমানিত হইতেছে, তাহাদের ধনসাম্রাজ্য লুণ্ঠিত হইয়াছে; তাহাদের মুসলমানের মত পোষাক পরিতে, আহার করিতে ও জীবন যাপন করিতে বাধ্য করা হইতেছে। পরিবারের পুরুষদিগকে মসজিদে যাইতে হয়। মৌলবী বাড়ীতে আসিয়া তাহাদিগকে শিক্ষা দেয়। আহার্যের জন্য—এমন কি

অস্তিত্ব পর্যন্ত টিকাইয়া রাখিবার জন্য তাহাদিগকে অবরোধকারীদের দয়ার উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে হয়। তাহারা যাহাতে তাহাদের সমাজ হইতে চিরতরে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইতে পারে, সেজন্য তাহাদিগকে দ্রুত পরিবর্তনের ভিতর দিয়া লইয়া যাওয়া হইতেছে। তাহাদের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া গেলেই তাহাদের আত্মসমর্পণ সম্পূর্ণ হইবে।

তাহারা প্রতিবাদ করিতে সাহসী হয় না; এমন কি বাহির হইতে যেসব হিন্দু তাহাদের গৃহে আসে, তাহাদের সহিত তাহারা দেখা পর্যন্ত করিতে সাহস করে না— যদি না আগন্তুকদের সহিত সশস্ত্র প্রহরী থাকে। পূর্বে যাহারা নেতৃস্থানীয় হিন্দু ছিল, তাহাদের পুরাতন এবং নূতন উভয়বিধ নাম ব্যবহার করিয়া প্রচারপত্র বিলি করা হইতেছে যে, তাহারা স্বেচ্ছায় নূতন ধর্ম গ্রহণ করিয়াছে এবং সকলকে ভবিষ্যতেও বর্তমানের মত অবস্থায় থাকিতে অনুরোধ করিতেছে; তাহারা স্বেচ্ছায় ধর্মান্তর গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া মহকুমা হাকিমদের নিকট আবেদন পাঠান হইতেছে। বাহিরে যাইতে হইলে তাহারা স্থানীয় মুসলীম নেতাদের স্বাক্ষরিত ছাড়পত্র লইয়া বাহিরে যাইতে পারে। আমরা যখন নোয়াখালির নিকট চৌমুহনীতে ছিলাম তখন তাহাদের কয়েকজন তথায় উপস্থিত হইতে সমর্থ হয়। দুইজন মুসলিম লীগ মন্ত্রী ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আমাদের সহিত তথায় আলোচনা করিতেছিলেন। আগন্তুকরা তাঁহাদের সম্মুখেই [illegible] মর্মবিদারী কাহিনী বর্ণনা করে।

এখন সর্বপেক্ষা জরুরী সমস্যা হইতেছে, যে বহুসংখ্যক লোক এখনও সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের মুষ্টির ভিতরে রহিয়াছে, তাহাদিগকে উদ্ধার করা। গ্রামগুলি পাহারা দিয়া রাখায় এবং রাস্তাঘাট বন্ধ করিয়া রাখায় এতদিন কাহারও পক্ষে উপদ্রুত এলাকায় প্রবেশ করা সুসাধ্য ছিল। এখন মিলিটারী উপদ্রুত এলাকায় যাতায়াত করিতে থাকায় ঐ এলাকায় যাতায়াত ক্রমশঃ সহজ হইয়া আসিতেছে। কিন্তু কেবল যাতায়াত করিলেই চলিবে না; ঐ সঙ্গে আমাদের স্বেচ্ছাসেবকদিগকে প্রত্যেকটি গ্রামে প্রবেশ করিয়া অবরুদ্ধ এলাকায় সহস্র-সহস্র হৃতবল হিন্দুর মনে বিশ্বাস ও নিরাপত্তার ভাব ফিরাইয়া আনায় সাহায্য করিতে হইবে।

সামরিক কর্তৃপক্ষ উপদ্রুত প্রত্যেকটি গ্রামে প্রবেশ করিবেন সিদ্ধান্ত করায় ভালই হইয়াছে। একে তো যাতায়াতের অসুবিধার জন্য তাঁহারা ইচ্ছামত দ্রুত যাতায়াত করিতে পারিবেন না, তদুপরি উপদ্রুত অঞ্চল হইতে যদি কয়েকজন স্থানীয় সরকারী কর্মচারীকে সরানো না হয়, তবে সামরিক কর্তৃপক্ষও পুরোপুরি কাজ করিতে পারিবেন না। অবিলম্বে পিটুনী-করও বসাইতে হইবে। ১৯৪২ সালের আন্দোলনের সময় কেবলমাত্র হিন্দুদের উপর পাইকারী জরিমানা ধার্য হইয়াছিল। বর্তমান দুর্বিপাকে মুসলমানরা সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়কে রক্ষা করিতে না পারায় পিটুনী-কর ধার্য করা সঙ্গত। বিষয়টি যখন আমি কয়েকজন স্থানীয় সরকারী কর্মচারীর সহিত আলোচনা করিতেছিলাম, তখন আমাকে বলা হয় যে, অনেক মুসলমান তাহাদের প্রতিবেশীকে সাহায্য করিয়াছিল। এ সম্বন্ধে আমার প্রস্তাব এই যে, কেহ যদি কর মকুবের দরখাস্ত করে, তবে দরখাস্তকারীকে প্রমাণ করিতে হইবে যে, সে সত্যই তাহার প্রতিবেশীকে সাহায্য করিয়াছিল। পাইকারী জরিমানালব্ধ অর্থ এবং সরকারী তহবিল হইতেও দুর্গতদিগকে যতদূর সম্ভব শীঘ্র ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে।

পুনর্বসতির প্রশ্নও অবিলম্বে বিবেচনা করিতে হইবে। শীঘ্রই ফসল কাটিবার সময় আসিবে। যাহারা অন্যত্র আশ্রয় লইয়াছে, তাহারা তাহাদের ভাগের ফসল না পাইলে তাহাদিগকে অনশনে থাকিতে হইবে। নিরাপত্তার মনোভাব ফিরিয়া না আসিলে পুনর্বসতি সম্ভব হইবে না। যাহাদের ঘরবাড়ী ও সম্পত্তি বিনষ্ট হইযাছে, তাহাদিগকে ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে। ঘরবাড়ি প্রস্তুত না হওয়া পর্যন্ত তাহাদিগকে গ্রামের নিকট বিশেষ ভাবে নির্মিত আশ্রয়শিবিরে স্থান দিতে হইবে। গ্রামে নিজেদের ঘরবাড়ি ও মন্দির পুনর্নির্মিত না হওয়া পর্যন্ত হিন্দুদের ভয় দূর হইবে না।

আমাদের সহস্র সহস্র ভ্রাতা-ভগিনী এইভাবে নতিস্বীকারে বাধ্য হইয়া হিন্দু সমাজের গণ্ডীর বাহিরে চলিয়া গিয়াছেন বলিয়া আমি মনে করিতে পারি না। তাঁহারা হিন্দু ছিলেন, তাঁহারা এখনও হিন্দু এবং তাঁহারা আমরণ হিন্দু থাকিবেন। আমাকে করিতে হইবে—কোন ব্যক্তিই এরূপ কোন কথা তুলিতে পারিবেন না। এই নির্দেশের বহুল প্রচার করিতে হইবে। প্রায়শ্চিত্তের কথা উঠিতেই পারিবে না।

যখনই কোন মহিলাকে উপদ্রুত অঞ্চল হইতে উদ্ধার করা হইবে, বলপূর্বক তাঁহাকে বিবাহ করা হইলেও তিনি বিনা বাধায় স্বীয় পরিবারে ফিরিয়া যাইবেন। যে সকল কুমারীকে উদ্ধার করা হইবে, যতদুর সম্ভব তাহাদিগকে বিবাহ দিতে হইবে।

যদি হিন্দুসমাজও দূরদৃষ্টির সহিত বর্তমান বিপদ উত্তীর্ণ না হইতে পারে, তবে ইহার ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন।

আমরা চৌমুহনী ও নোয়াখালিতে উদ্ধার, ও পুনর্বসতির জন্য প্রতিনিধি মূলক একটি কমিটি গঠন করিয়াছি। উপযুক্ত প্রহরায় ৫ জন করিয়া স্বেচ্ছাসেবকের দশটি দল উপদ্রুত অঞ্চলের অভ্যন্তরে যাত্রা করিবে।

আমি এই বিবৃতিতে পূর্ববঙ্গের একটি ক্ষুদ্র অংশের অবস্থা মাত্র বিবৃত করিয়াছি। আমরা যাহা দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি, সভ্য শাসনের ইতিহাসে তাহার তুলনা নাই। বাংলার অন্যান্য অংশে অবস্থা অতি উত্তেজনাপূর্ণ এবং কলকাতাসহ কয়েক স্থানেই হাঙ্গামা চলিতেছে। শাসনযন্ত্র সম্পূর্ণরূপে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে এবং ইহার জন্য গভর্নর ও মন্ত্রিসভাই দায়ী। আমরা বারবার সতর্ক করিয়াও বিফল হইয়াছি। আমরা ভালভাবেই দেখিতে পাইতেছি যে, বর্তমান শাসন অব্যাহত থাকিলে এই প্রদেশে ধনপ্রাণ আরও বিপন্ন হইবে।

এই বিপদের সময় হিন্দুদিগকে এ কথাটি হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে যে, তাহারা যদি সঙ্ঘবদ্ধ না হয়, তবে তাহাদের ভবিষৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইবে। সম্ভবতঃ বিধাতার ইহাই অভিপ্রায় যে, বিশৃঙ্খলা এবং ধ্বংস হইতেই হিন্দুদের সত্যকার জাগরণ আসিবে।

এই দুঃসময়েও আমরা যেন ভুলিয়া না যাই যে, আমরা ৩ কোটি হিন্দু বাংলাদেশে বাস করিতেছি। আমরা যদি সঙ্ঘবদ্ধ হই এবং আমাদের একটি অংশ যদি কোন বিপদেই ভ্রূক্ষেপ না করিয়া দৃঢ়সঙ্কল্পের সহিত সঙ্কটের সম্মুখীন হইতে প্রস্তুত হয়, তবে আমরা সমস্ত আক্রমণকারীকে পরাভূত করিয়া আমাদের মাতৃভূমিতে আমাদের সন্মানের আসন পুনরাধিকার করিতে পারিব। (নোয়াখালীর মাটি ও মানুষ ডঃ দীনেশ চন্দ্র সিংহ)

"প্রত্যক্ষ সংগ্রাম" বা Direct Action কলকাতার হিন্দুদের সমগ্র কলকাতা থেকে শেষ করে দিতে না পারলেও কংগ্রেস নেতাদের উপর তার ঈপ্সিত পরিণাম হয়েছিল। তাঁদের মনোবল সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছিল। দাঙ্গা ও দেশ বিভাগ হিন্দুদের কাছে অভিশাপ; নেতাজীর ভয়ে ভীত নেহরুদের কাছে তা আশীর্বাদ। ১০ অক্টোবর থেকে নোয়াখালি-ত্রিপুরায় নৃশংস হিন্দুবিরোধী দাঙ্গা ও পরে বিহারের দাঙ্গায় গান্ধী সমেত কংগ্রেসীরা দিশাহারা হয়ে পড়ে। অহিংসার আফিম খাইয়ে আর রামধুন গাইয়ে জাতিটাকে তো ভীরু কাপুরুষে পরিণত করে মুসলিম গুণ্ডাদের সহজ শিকারে পরিণত করেছে; সে সঙ্গে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের ফিরে আসার সম্ভাবনায় কংগ্রেসীদের বেহাল অবস্থা। এমন সময় পরিত্রাতারূপে গভর্ণর জেনারেল লর্ড মাউন্টব্যাটেনের আগমন এবং দেশ ভাগকেই পরিত্রাণের পন্থারূপে নির্দেশ।

একথা ভুললে চলবে না যে, কংগ্রেস সমস্ত হিন্দুদের ভোটে জয়ী হয়ে ইতিমধ্যেই দেশবিভাগ মেনে নিয়েছে এবং ঘোষণা করেছে যে অনিচ্ছুক অংশগুলিকে ভারতের মধ্যে থেকে যাবার জন্য জোর-জবরদস্তি করা হবে না।

এর থেকে ডঃ মুখার্জীর নিশ্চিত বিশ্বাস জন্মাল যে দেশবিভাগকে আর আটকানো যাবে না।

স্বাধীন যুক্ত বঙ্গের টোপ ঃ ফাঁদে পড়লেন শরৎ বসু
চক্রান্ত ব্যর্থ করলেন শ্যামাপ্রসাদ

দেশ ভাগ যখন স্থির হয়ে গেছে, তখন বাংলা ও পাঞ্জাবে প্রদেশভাগের দাবী উঠল। শ্যামাপ্রসাদ ছিলেন বাংলাভাগের অন্যতম প্রবক্তা। মুসলিম লীগ সমগ্র বাংলাকেই পাকিস্তান বানাতে চায়। হিন্দুরা যখন বাংলাভাগের দাবী তুলল, তখন তাদের চক্ষু চড়ক গাছ। প্রতিবেশী মুসলমানের নারকীয় মূর্তি ও পশুচরিত্রের পরিচয় পেয়ে হিন্দুদের যে অখণ্ড ভারত ও সোনার বাংলার স্বপ্ন টুটে গেছে, সেটা মিঞাসাহেবরা টের পাননি। এখন সম্বিত ফিরতেই সুরাবর্দী হিন্দুদের কাছে স্বাধীন যুক্ত বঙ্গের টোপ ফেলল। শরৎচন্দ্র বসু সে টোপ গিললেন। শ্যামাপ্রসাদ এই দুরভিসন্ধি মূলক প্রস্তাবের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেন এবং সারা বাংলায় তার বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুললেন। মুসলিম লীগ শাসনে ধন-প্রাণ ইজ্জতহারা হিন্দুরা কোনও মতেই ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীন যুক্ত বাংলার নামে মুসলিম শাসনে যেতে রাজী হয়নি। তারকেশ্বরে এক ঐতিহাসিক রাজনৈতিক সম্মেলনে স্বাধীন যুক্ত বঙ্গের প্রস্তাব নাকচ করে বাংলার হিন্দুসংখ্যাগরিষ্ঠ জেলাগুলি নিয়ে আলাদা রাজ্য গঠন করে ভারতীয় ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্ত থাকার প্রস্তাব গৃহীত হয়। শ্যামাপ্রসাদ ছিলেন ঐ সম্মেলনের সভাপতি। তারই পরিণতি অখণ্ড বাংলার প্রায় এক তৃতীয়াংশ নিয়ে পূর্ব ও পশ্চিম উভয় বাংলার হিন্দুদের শান্তি ও সসম্মানে বসবাস করার জন্য আলাদা পশ্চিমবঙ্গ নামক রাজ্যের সৃষ্টি।

কংগ্রেস ভারত ভাগ করেছে ঃ
আমি পাকিস্তান ভাগ করেছি—শ্যামাপ্রসাদ

অতএর দেশের যতখানি অংশকে পাকিস্তানে যাবার হাত থেকে বাঁচানো যায়, তার জন্য তিনি তাঁর সমস্ত শক্তি নিয়োগ করতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন; কারণ তিনি জানতেন যে ক্ষমতার জন্য মরিয়া কংগ্রেস নেতারা সারা বাংলা, এমনকি অসমকে পর্যন্ত পাকিস্তানের গ্রাসে তুলে দিতে দ্বিধা করবেন না। মূলতঃ শ্যামাপ্রসাদের প্রয়াসের ফলেই বাংলার এক-তৃতীয়াংশ ভারতের অন্তর্ভুক্ত রাখা সম্ভব হয়েছিল এবং তাকে রক্ষা করেছিলেন ডঃ মুখার্জী। এই ভাবে তিনি জিন্নার-স্বপ্নের অখণ্ড পাকিস্তানকেই বিভক্ত করে দিলেন ঃ—

"Congress partioned India and I partitioned Pakistan."

একথা শ্যামাপ্রসাদের শূন্য দম্ভোক্তি নয়। জিন্না-সুরাবর্দী-মাউন্টব্যাটেন-বারোজের দুরভিসন্ধিমূলক স্বাধীন যুক্তবঙ্গ তিনিই বানচাল করে দিয়েছিলেন।

কেন্দ্রিয় মন্ত্রীসভায় শ্যামাপ্রসাদ

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট পণ্ডিত নেহেরু সরকার গঠন করেন। ডঃ মুখার্জী মন্ত্রিসভায় যোগ দেন এবং শিল্প ও সরবরাহ দপ্তরের ভার নেন। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর হিন্দু মহাসভাকে রাজনীতিক কার্যকলাপ পরিত্যাগ করে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কাজে নিয়োগের উপদেশ দেন। মহাবোধি সোসাইটির সভাপতি পদে বৃত।

ভারতের বিভাজনের ফলে স্বাধীনতা লাভের প্রকৃত আনন্দ বহুলাংশে ম্লান হয়ে গেল। কংগ্রেস-মার্কা জাতীয়তাবাদের ব্যর্থতা এবং মুসলমানদের প্রতি কংগ্রেসের নীতিগুলি প্রকাশ হয়ে পড়ল। তখন ডঃ মুখার্জী সহ অন্যান্য সাধারণ মানুষেরাও আশা করলেন যে দেশবিভাগের তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে কংগ্রেস শিক্ষা গ্রহণ করবে এবং দেশের যে অংশ স্বাধীনতা অর্জন করেছে তাকে সংঘবদ্ধ করবে এবং তার পুনর্গঠনের দিকে দৃষ্টি রেখে নিজেদের নীতির পুনর্বিন্যাস করবে, কারণ সেটা করা হলেও পূর্ববঙ্গ, পশ্চিম পাঞ্জাব, উঃ পঃ সীমান্ত প্রদেশ ও সিন্ধু প্রদেশের হিন্দুদের ও অমুসলমানদের জীবন ও স্বার্থ সুরক্ষিত থাকবে। এই অংশগুলির দেশপ্রেমিক মানুষেরা অবশিষ্ট ভারতের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেছিল, কিন্তু এখন তাদের ঘোষিত ইচ্ছার বিরুদ্ধে পাকিস্তানের মোল্লাদের করুণার উপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, তাদের রক্ষা করা যায়নি।

এই আশা নিয়ে এবং সমগ্র ভারতের তথা বাংলার জনসাধারণের প্রতি কর্তব্যের প্রেরণাতেই ডঃ মুখার্জী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর মন্ত্রিসভায় ১৯৪৭ এর ১৫ই আগষ্ট যোগদান করেন, কারণ ঐসব মানুষেরা শ্যামাপ্রসাদকে তাদের অধিকারের রক্ষাকর্তা তথা অভিভাবক রূপে দেখতে শুরু করেছিল।

হিন্দু মহাসভা থেকে পদত্যাগ

১৯৪৯ সালে ভারত সরকারের পক্ষ থেকে পণ্ডিত নেহরু কর্তৃক জানুয়ারী মাসে বুদ্ধশিষ্য সারিপুত্ত ও মোগগালানার দেহাবশেষ ডঃ মুখার্জীর হাতে অর্পণ। আগস্টে মহাসভার ১৯৪৮, ১৫ই ফেব্রুয়ারীর সিদ্ধান্ত নাকচ এবং পুনরায় রাজনীতিক কার্যকলাপ শুরু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ। মহাসভার কার্যকরী সভা থেকে ডঃ মুখার্জীর পদত্যাগ।

মন্ত্রী সভা থেকে পদত্যাগের পটভূমি

স্বাধীনোত্তর ভারতে তিনি কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার অন্যতম বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন। ১৯৫০ সালে পূর্ব বাংলার হিন্দুদের উপর অমানুষিক অত্যাচারে ব্যথিত ও বিচলিত ডঃ মুখার্জী বহু যুক্তি-তর্ক দ্বারা পাকিস্তান এবং পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর অমানবিক হৃদয় পরিবর্তনে ব্যর্থ হন। পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের উপর অত্যাচারের বিরুদ্ধে কোনও কার্যকরী ব্যবস্থা না নিয়ে ১৯৫০ সালে নেহরু-লিয়াকত আলি চুক্তি সম্পাদন করে তিনি তাদের ভবিষ্যৎ বিপদের পথ খোলা করেন। পাকিস্তানের প্রতি প্রধানমন্ত্রীর তোষণ-নীতির ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তীব্র মতপার্থক্য এবং সেই কারণেই ৮ই এপ্রিল কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা থেকে ডঃ মুখার্জীর পদত্যাগ। উদ্বাস্তুদের সেবায় মনপ্রাণ দিয়ে আত্মনিয়োগ এবং তাদের সাহায্য ও পুনর্বাসনের জন্য বিস্তৃত জায়গায় পরিদর্শন। বাস্তুহারাদের ত্রাণকার্য ও পুনর্বাসনের ব্যাপারে আত্মনিয়োগ ও নানা স্থানে ভ্রমণ। মে মাসে ৫৫টি বাস্তুহারা কলোনির প্রতিনিধি সম্মেলনে আশুতোষ কলেজ হলে সভাপতিত্ব করেন।

এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি বিস্তৃত আলোচনার অপেক্ষা রাখে।

দশম অধ্যায়

পঞ্চাশের দাঙ্গা—বাঙালির সামাজিক বিপর্যয় ঃ পূর্ববঙ্গের গ্রামেগঞ্জে, হাটে-বাজারে, শহর-বন্দরে হিন্দুদের উপর একতরফা আক্রমণ ঃ হিন্দু সমাজের ভিত্তি চুরমার, ভারত সরকার নীরব দর্শক

"১৯৫০ বঙ্গজীবনের ইতিহাসে এক শোচনীয়তম অধ্যায়ের সূচনা করল। দেশবিভাগের যে বিষপাত্র গান্ধীজি বাঙালির হাত থেকে কেড়ে নিয়েছিলেন সেই বিষপাত্র এক অদৃশ্য নায়ক বাঙালির হাতে ফের তুলে দিল ১৯৫০-এর ফেব্রুয়ারির প্রথম দিকে। গান্ধীজির হত্যার পর সামগ্রিকভাবে এই উপমহাদেশে সাম্প্রদায়িক শান্তির এক বাতাবরণ তৈরি হয়েছিল। পূর্ববঙ্গের (পূর্ব পাকিস্তানের) হিন্দুরা নিজেদের অনেকটা নিরাপদ বোধ করতে আরম্ভ করেছিল। পূর্ববঙ্গের বাঙালি মুসলমানদের মনেও হিন্দুদের এই মুহূর্তে বিতাড়নের মানসিকতা গড়ে ওঠার কোনও লক্ষণও দেখা দেয়নি। ফলে পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক সরকারে ২৫ থেকে ২৮ শতাংশ হিন্দু কর্মচারি নিযুক্ত ছিল। বেসরকারি জীবনে অর্থাৎ শিক্ষা, আইনব্যবসা এবং চিকিৎসাক্ষেত্রে ওই সংখ্যা তখন ৫০ শতাংশেরও বেশি ছিল। সমাজজীবনের ওই অংশগুলি থেকে হিন্দুরা বিতাড়িত হলে বাঙালি মুসলমানেরা ওই শূন্যস্থানগুলি পূরণ করবে, এমন অবস্থা তখন তাদের ছিল না। ফলে কোনও রকম পূর্বাভাস ছাড়াই ১০ ফেব্রুয়ারির (১৯৫০) পর প্রদেশের প্রায় বারোটি জেলায় হিন্দুবিরোধী দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ল। এই দাঙ্গার এক ধাক্কায় প্রায় ৩৫ লাখ হিন্দু চলে এল পশ্চিমবঙ্গে, ত্রিপুরায় এবং অসমের ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা ও কাছাড় জেলায়। প্রতিহিংসামূলক দাঙ্গায় বিপন্ন হল পশ্চিমবঙ্গের শিল্পাঞ্চলের কাছাকাছি জেলার মুসলমানেরা। বাঙালি হিন্দু-মুসলমানের সম্পৃক্ত সমাজ জীবনকে এ রকম বড় আঘাত দেশবিভাগও দিতে পারেনি। এই দাঙ্গা পশ্চিমবঙ্গে চলে আসা প্রায় ত্রিশ লাখ নিম্ন ও মধ্যবিত্ত হিন্দু বাঙালির জীবনবোধ, মমত্ব, দায়ভাগ ও মূল্যবোধকে একেবারে ওলট-পালট করে দিল। পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে এক নতুন প্রজন্ম দেখা দিল, যাদের জন্ম রেললাইনের পাশে জবরদখল জমির কুঁড়েঘরে, এমনকী রেলগাড়ির পরিত্যক্ত কামরায়। শিয়ালদা স্টেশনের ৭৫/৮০ মাইলের মধ্যে ছড়িয়ে থাকা ধুবুলিয়া, বাদকুল্লা, রূপশ্রী, কুপার্সক্যাম্প, তাহেরপুর, রাণাঘাট, গয়েশপুর, ঘোলা প্রভৃতি শরণার্থী শিবিরের মেয়েদের দেখা যেতে লাগল সন্ধ্যার অন্ধকারে ধর্মতলা, চৌরঙ্গি, এসপ্ল্যানেডের মোড়ে। পাওয়া যেতে লাগল কলকাতার পতিতালয়গুলিতে 'বাঙাল' উচ্চারণভঙ্গির মেয়েদের অস্তিত্ব। শুধু বেঁচে থাকা, ভাইবোন ও বৃদ্ধ মা বাপের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য নিজেদের মানুষের ভগ্নাংশে পরিণত করা। সীমান্তশহর বনগাঁর লাখ লাখ শরণার্থীর মাঝে দাঁড়িয়ে ওই সময় সমাজ জীবনের এই অবনমনের কথা মনে রেখে জওহরলাল নেহরুকে বলতে হয়েছিল 'Partition of the country brought many evils at its trail। গান্ধীজির সেক্রেটারি অধ্যাপক নির্মলকুমার বসু বোধহয় একমাত্র বাঙালি যিনি তাঁর অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা দিয়ে শরণার্থীদের মানসিকতা সম্পর্কে কিছু গবেষণা করে ওই সময় রচনা করেছিলেন 'Social tension among East Pakistani refugees'।

সূচনা খুলনায় ঃ বিস্তার ঢাকায় ঃ বিধ্বস্ত বরিশাল ঃ তছনছ সারা পূর্ববাংলা

এবার বলছি ওই দাঙ্গার সূত্রপাত কীভাবে ঘটল। ১৯৫০ সালের ফেব্রুয়ারির প্রথম দিকে পশ্চিমবাংলা সরকারের গোয়েন্দাসূত্রে এ রকম সংবাদ পাওয়া গেল যে খুলনা জেলার বাগেরহাট মহকুমার কয়েকটি দূরবর্তী গ্রামে হিন্দু সংখ্যালঘুদের উপর কিছু আক্রমণের ঘটনা ঘটেছে। খুলনা রেল স্টেশনের প্ল্যাটফরমে বহু লোক ভিড় করে রয়েছে। কিন্তু বিশদ কোনও খবর নেই। কিন্তু ১১ ফেব্রুয়ারি খুলনা থেকে যে বরিশাল এক্সপ্রেস ট্রেনটি দুপুরের পর শিয়ালদা স্টেশনে পৌছানোর কথা, সেটি তখনও সীমান্তবর্তী বনগাঁ স্টেশনে পৌছায়নি। অবর্ণনীয় ভিড়ে ঠাসা ট্রেনটি এক শীতের বেলার শেষে বনগাঁ স্টেশনে এল। যাত্রীদের আকুল ক্রন্দন ও হাহাকার ছড়িয়ে পড়ল। রাজ্য সরকারের নির্দেশে পুলিশ ট্রেনটি কয়েক ঘন্টা আটকে রাখল। ১৫ ফেব্রুয়ারি থেকে পূর্ববাংলার জেলাগুলির ভয়াবহ দাঙ্গার সংবাদ আসতে লাগল।

মিথ্যা গুজব ছড়িয়ে দাঙ্গার সূত্রপাত

সব চেয়ে শোচনীয় অবস্থা ছিল বরিশাল জেলার। ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে ফজলুল হক সাহেব কলকাতায় আসেন তাঁর ঝাউতলা রোডের বাড়ি বিক্রির বন্দোবস্ত করতে। কলকাতায় তিনি তাঁর পুরনো বন্ধু ও আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করেন। কলকাতায় আসার দিন থেকেই পশ্চিমবাংলা সরকার তাঁর চলাফেরার জন্য তাঁকে একটি গাড়ি ও নিরাপত্তা রক্ষী দেন। কিন্তু ওই সময়ে বরিশাল শহরে ও গ্রামাঞ্চলে এই গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে কলকাতায় হিন্দুরা হক সাহেবকে খুন করে ফেলেছে। এই গুজবের প্রতিক্রিয়ায় বরিশাল শহর এবং ভোলা, পটুয়াখালি ও পিরোজপুর মহকুমার পাঁচ থেকে সাত হাজার হিন্দু খুন হয়েছে। বরিশালের পরিস্থিতি এমন এক অবস্থায় পৌছে গিয়েছিল যে ফজলুল হক সাহেব তাঁর কলকাতার সম্পত্তির বিক্রি বন্দোবস্ত স্থগিত রেখে দ্রুত বরিশালে ফিরে যান। শোনা গিয়েছিল যে হক সাহেব স্টিমার থেকে বরিশালের মাটিতে পা দিয়ে শহরে ও তার আশেপাশে ১৬টি জায়গায় সভা করে বলেছিলেন, 'তোমরা দেইখ্যা যাও আমি মরি নাই। কিন্তু তোমরা এই কী করলা!' এই দাঙ্গায় বরিশাল শহর থেকে স্টিমারে প্রায় সোয়া-ঘন্টার দূরত্বে অবস্থিত সায়েস্তাবাদ নামের একটি গ্রামের একজন হিন্দুও আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা পায়নি। বরিশালের পর দাঙ্গা ভয়াবহ আকার নেয় খোদ রাজধানী ঢাকায়, নারায়ণগঞ্জে, কুমিল্লার চাঁদপুর ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়, নোয়াখালি, শ্রীহট্ট এবং ফরিদপুরের গোপালগঞ্জ ও মাদারিপুর মহকুমায়।

পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের গোয়েন্দারা মুখ্যমন্ত্রী ডা. বিধানচন্দ্র রায়কে খবর দিল যে বরিশাল, চাঁদপুর, নারায়ণগঞ্জ, গোয়ালন্দ, খুলনা প্রভৃতি জংশন স্টেশন ও স্টিমারঘাটে কয়েক লাখ হিন্দু জড়ো হয়ে পশ্চিমবাংলায় চলে আসার জন্য আর্তনাদ করছে।

লাখুটিয়া জমিদার বাড়িতে অমানুষিক অত্যাচার

বরিশালের লাখুটিয়া ছিল সব থেকে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা, তিনি সেখানেও গিয়েছিলেন। লাখুটিয়ার জমিদার-পরিবার উপদ্রবের লক্ষ্যস্থল ছিল। মেয়েদের হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে এসে তাদের অপহরণ করা হয়েছিল। অভিজাত এক হিন্দু জমিদারের স্ত্রী কলকাতায় থাকতেন, কিন্তু ঐ সময় তিনি ওখানে ছিলেন। তিনি একদিন মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরে এসে তাঁর অভিজ্ঞতা বর্ণনা করলেন। বর্ণনা করলেন তাঁর গ্রাম লাখুটিয়ার হিন্দুদের দুর্দশার কথা।

ট্রেনে-স্টীমারে-পায়ে হেঁটে উদ্বাস্তুর স্রোত

ফেব্রুয়ারি মাসের (১৯৫০) শেষ নাগাদ পূর্ববাংলার জেলাগুলিতে হিন্দুদের উপর আক্রমণের ঘটনা কমতে আরম্ভ করলেও ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার কথা ভেবে দেশত্যাগের স্রোত বাড়তে লাগল। ওই সব জেলা থেকে রেলপথে কলকাতার দিকে আসতে হলে সেই সময় প্রধান তিনটি জায়গা থেকে ট্রেন ধরতে হত। ওই জায়গাগুলি হল গোয়ালন্দ, পার্বতীপুর ও খুলনা। ঢাকা, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম ও ফরিদপুর জেলার উত্তর ও পূর্বাঞ্চলের হিন্দুরা গোয়ালন্দে এসে জড়ো হতে লাগল। পূর্ব বাংলা প্রদেশের উত্তরাঞ্চলের জেলাগুলির হিন্দুরা পার্বতীপুর থেকে শিয়ালদা পর্যন্ত বিস্তৃত রেলপথের বড় স্টেশনগুলিতে জমায়েত হত। অন্য দিকে ফরিদপুরের পশ্চিম ও দক্ষিণাঞ্চলের এবং যশোর ও খুলনা জেলার দক্ষিণাঞ্চলের এবং সমগ্র বরিশাল জেলার হিন্দুরা লাখে লাখে এসে দাঁড়াত খুলনা স্টেশনে।

খুলনা থেকে শিয়ালদা স্টেশনের দূরত্ব ১১৬ মাইল। খুলনা থেকে পশ্চিমবঙ্গ সীমান্ত পর্যন্ত সড়ক যোগাযোগ ভাল থাকায় হাজার হাজার হিন্দু শরণার্থী বাসে করে সীমান্তে আসত। কিন্তু বরিশাল জেলার হিন্দুদের ভিড় স্টিমারঘাটে এত বেড়ে গেল যে স্টিমারে স্থান সংকুলান অসম্ভব হয়ে পড়ল। ওই স্টিমার তাদের খুলনা পৌঁছে দেবে। বরিশাল থেকে জলপথে খুলনা আসতে সময় লাগে প্রায় বারো ঘন্টা। সমুদ্রের মতো অনেকগুলি বড় নদী পাড়ি দিতে হয় স্টিমারকে। ফলে নির্দিষ্ট সংখ্যার বেশি লোক স্টিমারে তোলা যায় না। এই অবস্থায় মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায় ওই ব্রিটিশ স্টিমার কোম্পানির (আর-এস-এন এবং আই-জি-এন নামে এই দুই কোম্পানি পরিচিত ছিল) লন্ডন ও কলকাতার কর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। বিধানচন্দ্র রায়ের অনুরোধে কোম্পানি কর্তৃপক্ষ প্রায় একমাসব্যাপী বিশেষ স্টিমার চালাল বরিশাল স্টিমার ঘাট থেকে কলকাতার জগন্নাথ ঘাট পর্যন্ত। বরিশালের প্রায় এক লাখ হিন্দু এ ভাবে ৭২ থেকে ৭৫ ঘন্টা স্টিমারে থেকে কলকাতা এসে পৌঁছায়। এই শরণার্থীদের নিয়ে আসা স্টিমারগুলি জগন্নাথ ঘাটে ও 'ম্যান অব ওয়ার' জেটিতে নোঙর করলে অপেক্ষমান আত্মীয় স্বজনেরা কান্নায় ভেঙে পড়ত।

এদিকে ট্রেনে করে হিন্দু শরণার্থীদের আসা চলছে অবিরাম। পূর্ববঙ্গের এই দাঙ্গা এবং তার প্রতিক্রিয়ায় পশ্চিমবঙ্গের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে যে পরিস্থিতি সৃষ্টি করল সে সম্পর্কে সরোজ চক্রবর্তী তাঁর 'মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে' গ্রন্থে বলেছেন—

'কিন্তু ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহ থেকে পূর্ববঙ্গ থেকে যে উদ্বাস্তু-জনস্রোত আসতে লাগলো, সংখ্যায় তা হলো বৃহত্তম। এই সংখ্যা পূর্বের সমস্ত রেকর্ড ভঙ্গ করলো। খুলনা জেলার নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের ওপর ব্যাপক অত্যাচার হয়েছিল, এবং তার ফলে নরনারী ও শিশুদের এক বিশাল জনতা বনগাঁ সীমান্ত পার হয়ে ভারতে এসে পড়লো। পাকিস্তান সরকার হিংসাত্মক ঘটনার খবর প্রথম দিকে একেবারে চেপে দিয়েছিল। ডা. রায় সাবধান-বাণী উচ্চারণ করলেন, সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী তার প্রত্যুত্তর করলেন। এ সব বাদবিসম্বাদ সত্ত্বেও হিন্দু সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচারের ভয়াবহ কাহিনী চারদিকে আগুনের মতো ছড়িয়ে পড়লো, ১৩, ০০০ উদ্বাস্তু সীমান্তবর্তী নগর বনগাঁয় এসে হাজির হলো। রাজশাহী ও ঢাকাতে দাঙ্গা শুরু হয়ে গেল, কিন্তু সব থেকে ভয়াবহ ঘটনা ঘটলো বরিশালে। রেল স্টেশনে, স্টীমার-ঘাটে, আর ঢাকা বিমানবন্দরে অসহায় উদ্বাস্তুর দল আটকে পড়ে রইলো। ডা. রায় এদের ভারতে আনবার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করতে লাগলেন। কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশের অপেক্ষায় না থেকে তিনি নিজের দায়িত্বে ১৬ খানি ভাড়া-করা প্লেন ঢাকায় পাঠালেন ঐ আটকে পড়া মানুষদের নিয়ে আসতে। এয়ার ওয়েজ ইণ্ডিয়া লিমিটেডের তিনি নিজে ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি। সেই হিসাবে ঐ কোম্পানীর কে. কে. রায়কে টেলিফোন করে বললেন, যতখানি সম্ভব প্লেন ঢাকায় পাঠাও, আর যাদের আনবে, তাদের কাছ থেকে ভাড়া চাইবে না।' (বঙ্গ সংহার এবং... শ্রী সুখরঞ্জন সেনগুপ্ত)

ভারতের রাজনীতিতে ৫০-এর দাঙ্গার প্রতিক্রিয়া ঃ নির্বিকার উদাসীন নেহরু

শ্যামাপ্রসাদের অন্যান্য জীবনীকারদের রচনায়ও এই ভয়াবহ দাঙ্গা ও ভারতীয় মন্ত্রীসভায় তার প্রতিক্রিয়ার কথা বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়েছে। যেমন সবচেয়ে ভয়ঙ্কর অবস্থা হল ১৯৫০ সালে যখন পূর্ববঙ্গের হাজার হাজার হিন্দুদের পরিকল্পিত ভাবে বিরাট আকারে হত্যা করা হল। সরকারী হিসাব অনুসারে ৫০ হাজারেরও বেশী হিন্দুদের নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়, হাজার-হাজার হিন্দু নারীকে লুণ্ঠন করা হয় এবং তাদের উপর অবর্ণনীয় বর্বর অত্যাচার চালানো হয়। সামাজিক ভাবে সচেতন সমস্ত হিন্দুদেরই পূর্ববঙ্গ থেকে বিতাড়ন করা হয়। পাকিস্তান সরকারের প্রত্যক্ষ যোগসাজস ও প্ররোচনাতেই এইসব অমানবিক কাজ চলতে থাকে।

পূর্ববঙ্গ থেকে ছিন্নমূল মানুষদের মাধ্যমে এই সব পৈশাচিক হত্যালীলার সংবাদ ভারতের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়তেই সারা দেশ জুড়ে আন্দোলন শুরু হল। ক্ষমতাশীন বহু মানুষের মনেও এই ভীষণ সংবাদগুলি নাড়া দিল। তাঁরা উপলব্ধি করলেন যে পাকিস্তানের সঙ্গে চুক্তি করা অর্থহীন। এই কাগজের চুক্তিগুলিকে উল্লঙ্ঘন করাই তাদের একমাত্র কাজ। এই সমস্যা যে কতখানি জরুরী ও ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করেছে তা উপলব্ধি করে সমস্ত হিন্দুদের পূর্ববঙ্গ থেকে একেবারে নিশ্চিহ্ন করার অথবা বিতাড়িত করার পাকিস্তানী খেলা বন্ধ করার জন্য কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণের পরামর্শ দেওয়া হল। একথা সকলেই অনুভব করলেন যে সমস্যাটি

কোন সাম্প্রদায়িক নয় বরং রাজনৈতিক, প্রাদেশিক নয়, জাতীয়। শুধু একটি মাত্র লোকের মনে একটু আঁচড় কাটতে পারেনি এইসব ঘটনা—তিনি হলেন পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু। তাঁর জন্মগত দুর্বলতা যা তিনি জনসভায় দাঁড়িয়ে বড় বড় গালভরা আদর্শের বুলি ও মনোহারী অভিনয়-ভঙ্গীর তলায় সাফল্যের সঙ্গে লুকিয়ে রেখেছিলেন, তাঁকে কোন দৃঢ় ও দ্রুত পদক্ষেপ নিতে দেয়নি। পূর্ববঙ্গে যখন আগুন জ্বলছিল, তখন তিনি অকারণ সময় নষ্ট করছিলেন এবং কোনও সিদ্ধান্ত নিতে পারছিলেন না।

সিদ্ধান্তহীন জহরলাল ঘাতকের হাত আঁকড়ে ধরতে উদ্যত

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার কয়েকজন মন্ত্রীসহ প্রত্যেকেই সরকারের নীচাশয়তায় লজ্জিত বোধ করছিলেন। স্বভাবতঃই শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী এই শোকাবহ ঘটনায় সব থেকে বেশী আহত বোধ করছিলেন। তিনি পণ্ডিত নেহরুর কালক্ষেপের নীতির বিরুদ্ধে মন্ত্রিসভার মধ্যেই অভিযানের নেতৃত্ব দিলেন। এই অবস্থার বিষয়ে আলোচনার জন্য মন্ত্রিসভার অনেকগুলি বৈঠকে গৃহীত প্রতিবেদনগুলি তিনি হাতের কাছেই তৈরী রেখেছিলেন। কিন্তু তাঁর সমস্ত প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে গেল, যখন তিনি জানতে পারলেন যে পণ্ডিত নেহরু আবার মিঃ লিয়াকত আলি খানকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন, যার হাত থেকে এখনও হাজার হাজার নিরপরাধ হিন্দুর রক্ত টপ্-টপ্ করে ঝরছে—তার সঙ্গে আবার একটি চুক্তি করবেন এবং পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘুদের কল্যাণের বিষয়ে কতকগুলি পবিত্র ঘোষণা করিয়ে নেবেন। শ্যামাপ্রসাদ এই ধরনের উদ্যমের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান। তিনি প্রধানমন্ত্রীকে আগের চুক্তিগুলির ব্যর্থতার কথা স্মরণ করিয়ে দেন এবং লিয়াকত আলির ফাঁদে আবার পা দেবার বিষয়ে সতর্ক করে দেন-যে লিয়াকত পাকিস্তানে তাঁর পৈশাচিক নীতির নিশ্চিত প্রতিফল এড়াবার জন্য সক্রিয় হয়ে উঠেছেন।

কিন্তু প্রধানমন্ত্রী ডঃ মুখার্জীর অকাট্য যুক্তি খারিজ করে দিলেন এবং তাঁর যুক্তিতে এঁটে উঠতে না পেরে তাঁর স্বভাবমত অকারণ মেজাজ গরম করে ফেললেন। অবস্থা এমন পর্যায় গিয়ে দাঁড়াল যে ডঃ মুখার্জী তাকে ধমক দিতে বাধ্য হলেন এবং বললেন যে পূর্ববঙ্গে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তার ফলে উদ্ভূত গুরুতর জাতীয় সমস্যাগুলি সম্বন্ধে প্রধানমন্ত্রী কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার যৌথ দায়িত্ব তথা যৌথ আলাপ-আলোচনার সমস্ত ঐতিহ্য ও রীতি-নীতি উল্লঙ্ঘন করছেন।

মর্মাহত শ্যামাপ্রসাদের পদত্যাগ ঃ পূর্ববঙ্গের হিন্দুরা ভারতের সংরক্ষণের অধিকারী — শ্যামাপ্রসাদ

তখন থেকেই ডঃ মুখার্জী অনুভব করতে লাগলেন যে মন্ত্রিসভার মধ্যে থেকে তিনি দেশের কোন মঙ্গল করতে পারবেন না, অথবা পূর্ববঙ্গের মানুষদের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তাও পূরণ করতে পারবেন না। মাতৃভূমির সেবা করার জন্য আড়াই বছর আগে তিনি সরকারের যে মর্যাদাসম্পন্ন পদ গ্রহণ করেছিলেন, কর্তব্যের আহবানে সাড়া দিয়ে এবার

তাঁকে বাইরে বেরিয়ে আসতে হবে। অতএব, তিনি ১লা এপ্রিল তারিখে তাঁর পদত্যাগ পত্র পাঠিয়ে দিলেন এবং পণ্ডিত নেহরু অতি তৎপরতার সঙ্গে তাঁর পদত্যাগপত্র গ্রহণ করে তাঁকে সরকারী দায়িত্বভার থেকে মুক্তি দিলেন। এই সংকট মুহূর্তে ডঃ মুখার্জীর মন্ত্রিসভা থেকে বিদায় গ্রহণ অন্যান্য মন্ত্রীদের বিশেষতঃসর্দার প্যাটেলের ভাল লাগল না। এমনকি পণ্ডিত নেহরু ও পরে ডঃ মুখার্জীকে তাঁর সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করার ও পদত্যাগ পত্র প্রত্যাহারের অনুরোধ জানান। সাধারণ মাপের কোন মানুষ এই সব চাপের কাছে নতি স্বীকার করে নিতেন। কিন্তু ডঃ মুখার্জী অন্য ধাতুতে গড়া মানুষ ছিলেন। নাম, যশ, বিরাট পদের জাঁকজমকের প্রতি তাঁর কোন আকর্ষণ ছিল না। এক সত্যিকারের সন্ন্যাসীর মত নিজের ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও পদমর্যাদার চেয়ে তিনি জনগণের প্রতি নিজ কর্তব্য এবং নিজের বিবেকের নির্দেশিত পথে কাজ করতেই বেশী ভালবাসতেন। এইভাবে তিনি প্রমাণ করলেন যে তিনি ভগবানের গীতার দ্বারা অনুপ্রাণিত প্রকৃত অর্থেই একজন কর্মযোগী।

১৯৫০ সালের ১৯শে এপ্রিল ডঃ মুখার্জী সংসদে মন্ত্রিসভা থেকে তাঁর পদত্যাগের বিষয়ে যে বিবৃতি প্রদান করেন, তাতে ভারত-পাকিস্তান সম্পর্কের সমস্যাগুলি সম্বন্ধে তাঁর মতামত সুন্দরভাবে প্রকাশিত হয়েছে। তিনি কেন নেহরু-লিয়াকত চুক্তির অংশীদার হতে পারেননি তার প্রধান কারণগুলিও তিনি তুলে ধরেন। তাঁর সম্পূর্ণ বিবৃতিটি বার-বার পাঠ করা উচিত, কারণ কোন্ শক্তি পাকিস্তানের শাসকদের পরিচালিত করছে সেটা যে তিনি ধরতে পেরেছেন, তা এই বিবৃতির মাধ্যমে তিনি উদ্‌ঘাটিত করেছেন, যার ফলে সমস্ত ভারত-পাক সমস্যা সম্বন্ধে তাঁর মূল্যায়ন অতীব বাস্তব ও সত্যনিষ্ঠ হয়ে উদ্‌ভাসিত হয়েছে। পরবর্তী ঘটনা-পরম্পরায় তাঁর ভয়ঙ্কর আশংকা যে কত সত্য তা প্রমাণিত হয়েছে এবং আজও যে সমস্ত হিন্দুরা পাকিস্তানে বাস করছেন, তাঁদের সামনে দুটি মাত্র তিক্ত পথ খোলা আছে—হয় ইসলামে নিজেদের ধর্মান্তরিত করা, নয় তো উদ্বাস্তু হয়ে দলে-দলে ভারতে চলে আসা। এখন এটা প্রায় নিশ্চিত হয়ে গেছে যে তারা হিন্দু হিসাবে পাকিস্তানে সম্মান ও নিরাপত্তা নিয়ে বাঁচতে পারবে না, যদি না ভারতের জনগণ ও ভারত সরকার তাদের হয়ে কোন দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

এই কাজ করলে ভারত তার বিশ্বস্ত ও দেশপ্রেমিক সন্তানদের প্রতি তার কর্তব্যই পালন করবে, যাদের অতি বেদনাদায়ক অবস্থা ভারতবাসীর প্রতি ডঃ মুখার্জীর আহ্বানেই প্রতিফলিত। মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগের সময় ডঃ মুখার্জী দেশবাসীর নিকট যে আহ্বান জানিয়েছিলেন, সেটা ছিল পাকিস্তানের হিন্দুদের প্রতি ন্যায়বিচার করার জন্য জনমতকে সংঘবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে। তিনি বলেছিলেন —

''আমরা যেন ভুলে না যাই যে পূর্ববঙ্গের হিন্দুরা ভারতের সংরক্ষণ লাভের অধিকারী, শুধু মানবিকতার কারণেই নয়, বরং ভারতের রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও বৌদ্ধিক প্রগতির

ভিত্তি গড়ে তোলার জন্য তারা বংশের পর বংশব্যাপী সানন্দে নিঃস্বার্থভাবে যন্ত্রণা ভোগ করেছেন ও ত্যাগ স্বীকার করেছেন, তার দরুনই আমাদের তাঁদের পাশে এসে দাঁড়ানো কর্তব্য। ভারতের জন্য সেখানকার স্বর্গগত নেতাদের ঐক্যবদ্ধ আহ্বান এবং যুবকদের হাসতে-হাসতে ফাঁসির মঞ্চে শহীদের মৃত্যুবরণ আজ স্বাধীন ভারতের কাছে ন্যায় তথা সুবিচার দাবী করে।"

Dr. Shyamaprasad Mukherjee: A Biography–Prof. Balraj Madhok (অনুবাদ-শ্রী জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়)

পূর্ববঙ্গের হিন্দু সমস্যার সমাধানে নিরলস প্রচেষ্টা

"পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘুদের জীবন-মরণ প্রশ্নের সুসমাধানে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য তিনি সারা ভারতবাসীকে যে আহ্বান জানাইয়াছিলেন, তাহাতে তিনি বিপুল সাড়া পাইয়াছিলেন। ১৯৫২ সালে অন্যান্য রাজনৈতিক দল তাঁহার দলের সহিত এক হইয়া সারা ভারতব্যাপী যে আন্দোলন শুরু করিয়াছিলেন, তাহা বর্তমান দিনের রাজনৈতিক আন্দোলনের অন্যতম ঘটনা। আচার্য কৃপালনী ও জয়প্রকাশনারায়ণের প্রজাসোস্যালিষ্ট পার্টি হইতে আরম্ভ করিয়া কংগ্রেস ও কম্যুনিষ্ট ব্যতীত সমস্ত রাজনৈতিক দল তাঁহার আন্দোলনের পিছনে দাঁড়ান। কংগ্রেস সরকার ইহাকে সাম্প্রদায়িক আখ্যা দিয়ে বানচাল করিবার চেষ্টা করিলেও 'নিখিল ভারত পূর্ববঙ্গ' দিবস উদ্‌যাপনে বিপুল সাড়া পাওয়া যায়।"

ভারতকেশরী শ্যামাপ্রসাদ

সর্দার প্যাটেলের মৃত্যুর পর নিরঙ্কুশ জওহরলালের সামনে দাঁড়াবার মত ব্যক্তি শ্যামাপ্রসাদ ছাড়া কেউ ছিল না। ভারতীয় পার্লামেন্টে শ্যামাপ্রসাদের সিংহগর্জ্জনে জওহরলালের ব্যক্তিত্ব প্রতিনিয়ত হীনপ্রভ হয়ে পড়ছিল। জনসঙ্ঘের প্রচারকার্য্যে যখন শ্যামাপ্রসাদ বোম্বাইতে যান, প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ শ্রোতার সভায় তার বজ্রকণ্ঠের বাণী বিঘোষিত হতে লাগলো। প্রতিদিন সেখানকার দৈনিকপত্রে "The lion of Bengal roars." এই প্রকাণ্ড শিরোনামায় শ্যামাপ্রসাদের বক্তৃতা প্রকাশিত হতো। দুঃখের ও দুর্ভাগ্যের বিষয় বাঙ্গলার এই সিংহ পুরুষের সিংহগর্জ্জন বাঙ্গলার কোনো দৈনিকের অলক্ষিত কোণে ছাড়া স্থান পেতো না।

একাদশ অধ্যায়

জনসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ পর্ব

১৯৫০ সালে পূর্ববঙ্গের প্রশ্নে শ্রীনেহেরুর সহিত পূর্বপাকিস্তানের হিন্দুদের উপর অমানবিক আচরণের জন্যে মতানৈক্য হওয়ায় ভারতীয় মন্ত্রিসভা হইতে তিনি পদত্যাগ করেন। তিনি বাস্তুহারাদের পুনর্বাসন ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। ১৯৫১ সালের জুন মাসে জনসাধারণের আহ্বানে পিপল্স্ পার্টি বা 'জনসঙ্ঘ' নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠন করেন। এই জনসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করিয়া কলকাতার শ্রদ্ধানন্দ পার্কে এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, কথা বলার পর কাজের লোক পাওয়া যায় না। তিনি জনসংঘের উদ্দেশ্য বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন যে, সমগ্র ভারতে সুসংহত জনমত গঠন, পদদলিত জনসাধারণের অধিকার-প্রতিষ্ঠা, জাতি-ধর্ম্ম-নির্বিশেষে সকলের মধ্যে মৈত্রী স্থাপন, উদ্বাস্তু পুনর্বাসন, ভারতে গণতান্ত্রিক আদর্শ প্রতিষ্ঠা এবং ভারতের ঐতিহ্য ও সাধনার পুনরুজ্জীবনই এই নবগঠিত প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য। তিনি এই প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। **সরকারের পাকিস্তান তোষণ নীতির বিরোধিতা। অক্টোবর মাসে ১৯৫১. দিল্লিতে ডঃ মুখার্জীর সভাপতিত্বে ভারতীয় জনসঙ্ঘের অধিবেশন। সারা ভারতে বহু অনুরাগীর সমর্থনলাভ। পার্লামেন্টে ভারতীয় সংবিধান বিলের মৌলিক অধিকার-সংক্রান্ত অংশ বিধিবদ্ধ হওয়ার বিরুদ্ধে সবল প্রতিরোধ।**

১৯৫১ সালের ১৬ জানুয়ারি পাঞ্জাব ও দিল্লীর কয়েকজন বিশিষ্ট নাগরিক, যেমন—লালা হংসরাজ গুপ্তা, শ্রীধরমবীর, পণ্ডিত মৌলিচন্দ্র শর্মা, ভাই মহাবীর, মহাশয় কৃষ্ণ, রোটকের চৌধুরী শ্রীচন্দ, জলন্ধরের লালা বলরাজ ভাল্লা এবং অধ্যাপক বলরাম মাধোক নতুন দিল্লীতে মিলিত হয়ে পাঞ্জাব, পেপসু, হিমাচলপ্রদেশ এবং দিল্লীর জন্য একটি নতুন রাজনৈতিক দলের প্রাথমিক কাঠামো রচনা করতে বসেন। ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীকে এই সভায় বিশেষভাবে আমন্ত্রিত করা হয়েছিল, যাতে তিনি তাঁর মূল্যবান পরামর্শ ও সুচিন্তিত পথ নির্দেশ দিতে পারেন। কারণ, তিনিও প্রায় একই সময়ে কলকাতায় বাঙালী প্রতিনিধিদের এক সম্মেলন আহবান করেন। যেখানে তাঁকে সভাপতি করে পিপল্স্ পার্টি বা জনসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করার সিদ্ধাত গৃহীত হয়।

জনসঙ্ঘের সভাপতি পদে শ্যামাপ্রসাদ

আনুষ্ঠানিক ভাবে অখিল ভারতীয় জনসঙ্ঘের উদ্বোধনের পূর্বে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেবার ছিল যে এর প্রথম সভাপতি কে হবেন। অবশ্য, নূতন সংগঠনের উদ্যোক্তাদের এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে খুব বেশী চিন্তা করতে হয়নি যে এই সম্মানের যোগ্যতম ব্যক্তি ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী। সারা দেশে তাঁর মত বিরাট ব্যক্তিত্ব ও ক্ষমতাসম্পন্ন এমন কোন মানুষই ছিলেন না, যিনি সংগঠনের দায়িত্ব বহন করতে পারেন, যে সংগঠন তার জন্মলগ্ন থেকেই এক শক্তিশালী দল রূপে চিহ্নিত তথা স্বীকৃত হবে।

১৯৫১ সালের ১১ই অক্টোবর সকাল প্রায় ৮টার সময়ে লালা হংসরাজ গুপ্ত, প্রফেসর মহাবীর, পণ্ডিত মৌলিচন্দ্র শর্মা এবং বর্তমান লেখক নতুন দিল্লীর ১০নং পুসা রোডে ডঃ মুখার্জীর সঙ্গে দেখা করে উক্ত প্রস্তাবে তাঁর সম্মতি দেবার অনুরোধ করতে গেলেন। ডঃ মুখার্জী তাঁর বাসস্থানের বারান্দায় এসে প্রশান্ত হাসিমুখে সকলকে স্বাগত জানালেন এবং সবাইকে তাঁর ছোট ঘরে নিয়ে গেলেন, যেখানে তিনি তাঁর স্বাভাবিক অভ্যাস মত ভোর সাড়ে ৬টায় প্রাতঃ ভ্রমণের পর লেখা-পড়ার কাজে ব্যস্ত ছিলেন। তাঁর পরনে ছিল মোটা কাপড়ের ধুতি, পাঞ্জাবি, মোটা তুসের চাদর এবং পায়ে ছিল সাধারণ চটি। ঘরে সকলের বসার মত যথেষ্ট আসন না থাকায় ডঃ মুখার্জী নিজেই পাশের বসার ঘর থেকে চেয়ার আনতে গেলেন। আমরা সকলে বসার পরে তিনি নিজে বসলেন।

আনুষ্ঠানিক সৌজন্য বিনিময়ের পর লালা হংসরাজ গুপ্ত তাঁর নিজস্ব অননুকরণীয় ভঙ্গীতে, কিছুটা গুরু-গম্ভীর ও কিছুটা সরস ভাষায় সকলকে উজ্জীবিত করে আসল কথাটা উত্থাপন করলেন। লালা হংসরাজের কথা শেষ হবার পরে কিছুক্ষণ নিস্তব্ধতা বিরাজ করছিল। ডঃ মুখার্জীর মুখটা গম্ভীর হয়ে গেল। তিনি তাঁর বিশাল দেহ আরামকেদারায় ছড়িয়ে দিলেন এবং কয়েক মিনিট গভীর চিন্তায় ডুবে গেলেন। তারপর মৌনতা ভঙ্গ করে তিনি নিম্নলিখিত সুচিন্তিত মন্তব্য প্রকাশ করলেন।

"আপনারা আমার উপরে এক বিরাট দায়িত্ব অর্পণ করতে চাইছেন। আমি দেশমাতৃকার প্রতি আমার বিনম্র কর্তব্যের মনোভাব নিয়ে এই দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করব। কিন্তু এই দায়িত্ব গ্রহণের পূর্বে আপনারা যে সংগঠনের নেতৃত্ব দিতে চাইছেন তার চরিত্র ও ভবিষ্যৎ কার্যপদ্ধতি সম্বন্ধে আমি আমার মনের মধ্যে সুস্পষ্ট ধারণা পেতে চাই"।

পুনরায় এক মিনিটের নীরবতার পরে তাঁর মুখমণ্ডলে জিজ্ঞাসা-চিহ্ন ফুটে উঠল এবং তিনি জনসঙ্ঘের চরিত্র ও কার্যপদ্ধতি কী রকম হবে সে বিষয়ে তাঁর চিন্তা ব্যক্ত করলেন, বিশেষতঃদেশের অন্যান্য জাতীয়তাবাদী শক্তি ও সংগঠন—সাংস্কৃতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক সংগঠনসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁরা মনোভাব বিস্তারিতভাবে প্রকাশ করলেন।

তাঁর মনশ্চক্ষুর সম্মুখে সুস্পষ্টভাবে উদ্ভাসিত হল যে জনসংঘ ভারতের জাতীয়তাবাদী শক্তিগুলির অগ্রনায়কের ভূমিকা গ্রহণ করবে, অতএব তিনি এই সংগঠনকে এমন প্রশস্ত তথা উদার করে তুলতে চাইছিলেন যাতে ঐ সমস্ত শক্তিগুলিকে ব্যাপকভাবে সংঘবদ্ধ করে জনসংঘ একটি সার্থক তথা কর্মক্ষম রাজনৈতিক সংগঠনে পরিণত হয়ে উঠতে পারে। ভারতের সমস্ত নাগরিকের কাছেই এর দ্বার উন্মুক্ত থাকবে যারাই দেশমাতৃকার প্রতি এবং তার সুমহান্ সংস্কৃতি তথা ঐতিহ্য-পরম্পরার প্রতি অনন্য ও নিঃশর্ত আনুগত্য পোষণ করবে, যে সংস্কৃতি অনিবার্যভাবেই হিন্দু সংস্কৃতি।

সেই দিন থেকেই ডঃ মুখার্জী নূতন সংগঠনটিকে গড়ে তোলার কাজে প্রাণ-মন উজাড় করে দিলেন। দিনের পর দিন তিনি ঘন্টার পর ঘন্টা অধ্যাপক মহাবীর, পণ্ডিত মৌলিচন্দ শর্মা এবং বর্তমান লেখকের (অধ্যাপক বলরাজ মাধোক) সঙ্গে জনসংঘের খসড়া ঘোষণাপত্র

চূড়ান্ত করার বৈঠক করেন, যে ঘোষণাপত্র সর্বভারতীয় সম্মেলনে উপস্থাপন করা হবে। নূতন দলের অর্থনৈতিক কার্যক্রম সম্বন্ধে আলোচনার সময়ে মাতৃভূমির অর্থনৈতিক ব্যাধি এবং তার নিরাময় সম্বন্ধে তাঁর বাস্তবোচিত ও গঠনমূলক উপায় সম্বন্ধে তাঁর গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। সেদিন পর্যন্ত আমার ধারণা ছিল যে ডঃ মুখার্জী সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির চেয়ে ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিরই বেশী পক্ষপাতী। কিন্তু তাঁর সঙ্গে আলোচনা করার পর আমি উপলব্ধি করলাম যে আমার ধারণা কত ভ্রান্ত ছিল। অর্থনৈতিক সমস্যা সম্বন্ধে তাঁর চিন্তাধারা কোন পাঠ্য পুস্তকের সাধারণ প্রবচনের বা সিদ্ধান্তের রঙে রঞ্জিত ছিল না। তাঁর ব্যবহারিক চিন্তা ছিল ভারতের পরিস্থিতির কঠোর বাস্তবতার দ্বারা নির্দেশিত এবং ভারতের কোটি-কোটি মানুষের কল্যাণ ও ভারতের দ্রুত অর্থনৈতিক বিকাশের সর্বোচ্চ আকাঙ্ক্ষার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। সেই কারণে কিছু বিষয়ে তাঁর চিন্তাধারা সাম্যবাদী, আবার কোন-কোন বিষয়ে ধনতন্ত্রবাদী বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু আসলে এর কোনটিই ঠিক নয়, তাঁর চিন্তা ছিল মূলতঃ ভারতীয়।

জনসঙ্ঘের নীতি ও আদর্শ ঃ ডঃ মুখার্জীর প্রথম ভাষণ

উল্লিখিত সর্বভারতীয় সম্মেলন নতুন দিল্লীর রাঘোমল আর্য উচ্চ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হল। বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে এক বিরাট প্যাণ্ডেল তৈরী করা হল যার মধ্যে সারা ভারতের পাঁচ শত প্রতিনিধি ছাড়াও দিল্লীর এক হাজার বিশিষ্ট নিমন্ত্রিত নাগরিকদের স্থান সংকুলান হল।

সম্মেলনের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুসারে অখিল ভারতীয় জনসংঘ আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে দলের খসড়া সংবিধান ও ঘোষণাপত্রও গৃহীত হয়। অবশ্য, সম্মেলনের কার্যসূচীর সব থেকে রোমাঞ্চকর অংশ ছিল প্রথম সভাপতি রূপে সংগঠনের নেতৃত্ব করার জন্য ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর নির্বাচন। পাঞ্জাবের লালা বলরাজ ভাল্লা তাঁর নাম প্রস্তাব করেন এবং বিভিন্ন প্রদেশের বিশিষ্ট প্রতিনিধিরা তাঁকে সমর্থন করেন। তাঁরা সকলেই শ্যামাপ্রসাদের দেশমাতৃকার প্রতি নিঃস্বার্থ সেবার মহৎ অবদান এবং তাঁর প্রজ্ঞা ও উদার হৃদয়ের গুণসম্পদের জন্য তাঁর প্রতি আবেগমথিত ভাষায় আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

ডঃ মুখার্জীর নিকট এটা ছিল এক নূতন অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বের সূচনা এবং পরবর্তী ঘটনাবলীতে যা প্রমাণিত হয়, তাঁর উৎসর্গীকৃত জীবনের সব থেকে উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। তিনি জানতেন যে তাঁর কাজ খুব সহজ হবে না। কিন্তু তাঁর নিজের উপর এবং তাঁকে সাহায্যকারী প্রতিটি যুবক সহকর্মীর উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস ছিল। সারা ভারতের কাজের জন্য তিনি পণ্ডিত মৌলিচন্দ্র শর্মা, এবং ভাই পরমানন্দের তরুণ ও বহুমুখী কর্মক্ষমতার অধিকারী পুত্র অধ্যাপক মহাবীরকে তাঁকে সাহায্য করার জন্য সাধারণ সম্পাদক নিযুক্ত করেন।

ঐ ঐতিহাসিক সম্মেলনে সভাপতির অভিভাষণে শ্যামাপ্রসাদ তাঁর রাজনৈতিক দর্শন, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সমস্যাগুলি সম্বন্ধে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী এবং যে সংগঠনকে তিনি নেতৃত্ব দিতে চলেছেন সেটি কোন পথে চলবে তার সারাংশ তুলে ধরেন।

তিনি ভাষণ দেবার জন্য উঠে দাঁড়ালে কিছু সংখ্যক প্রতিনিধি যাঁরা তাঁর ইংরাজী ভাষণ শুনতে আগ্রহী ছিলেন, তাঁকে ইংরেজী ভাষায় তাঁর সভাপতির ভাষণ দিতে অনুরোধ করেন। তখন পর্যন্ত ডঃ মুখার্জী হিন্দী খুব ভাল বলতে পারতেন না। কিন্তু সর্বভারতীয় রাষ্ট্রীয় সম্মেলনে তিনি রাষ্ট্রভাষা হিন্দীতেই ভাষণ দেবার আগ্রহ প্রকাশ করলেন।

তিনি প্রথমেই এ কথা পরিষ্কার করে জানিয়ে দিলেন যে শুধু আসন্ন সাধারণ নির্বাচনে লড়াই করবার জন্য ভারতীয় জনসংঘের জন্ম হচ্ছে না, এবং নির্বাচনের ফলাফল যাই হোক না কেন "আমাদের সংগঠনকে তারপরেও সর্বশ্রেণীর জনসাধারণের নিকট আশা ও শুভ সংকল্পের বাণী নিয়ে কাজ করে যেতে হবে এবং অধিকতর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ ও আরো উন্নতিশীল স্বাধীন ভারতকে পুনর্গঠিত করার কাজে জনসাধারণের সর্বশ্রেষ্ঠ কর্মপ্রচেষ্টাকে কাজে লাগাবার প্রয়াস করে যেতে হবে।"

নতুন দল গঠনের আবশ্যকতা

নূতন দলের আবশ্যকতার কথা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেন, "কংগ্রেস শাসনে স্বৈরতন্ত্রের প্রাদুর্ভাব ঘটার অন্যতম প্রধান কারণ হল একটি সুসংগঠিত বিরোধী দলের অভাব। এইরূপ একটি বিরোধী দলই শুধু সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের উপর সুস্থ অঙ্কুশের কাজ করতে পারে এবং দেশের সামনে একটি বিকল্প সরকারের সম্ভাবনার কথা তুলে ধরতে পারে।"

তিনি ঘোষণা করেন যে "আজ ভারতীয় জনসংঘ একটি সর্বভারতীয় রাজনৈতিক দল রূপে অবির্ভূত হয়েছে যে দল দেশের প্রধান বিরোধী দল রূপে কাজ করবে।" তিনি বলেন যে " বিরোধিতার অর্থ এই নয় যে একটি দায়িত্বশীল সরকারের সম্মুখে যে সমস্যাই আসুক তার প্রতি অর্থহীন অথবা ধ্বংসাত্মক দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করতে হবে। অতএব, আমাদের হয়ত সরকারী পদক্ষেপ বা আইনের বিরুদ্ধে সমালোচনা বা আক্রমণ করতে হতে পারে, কিন্তু আমাদের লক্ষ্য হবে সব সমস্যার প্রতি গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গী, যাতে আমরা জনসাধারণকে সজাগ সতর্ক রাখতে পারি এবং আমাদের দেশের সুষ্ঠু প্রশাসনের জন্য একটি বাস্তবিক গণতান্ত্রিক কাঠামো গড়ে তোলার ব্যাপারে আমাদের বিনম্র অবদান রাখতে পারি।"

জনসঙ্ঘের নীতি ও গঠনতন্ত্র নির্ধারণ

ভারতীয় জনসংঘের গঠন ও চরিত্র সম্পর্কে বিবৃতি দিতে গিয়ে তিনি ঘোষণা করেন যে "আমরা ধর্মমত, জাত-পাত তথা সম্প্রদায় নির্বিশেষে ভারতের সমস্ত নাগরিকের জন্য আমাদের দলের দরজা উন্মুক্ত রেখেছি। আমরা স্বীকার করি যে আচার-ব্যবহার, অভ্যাস, ধর্মবিশ্বাস ও ভাষার ব্যাপারে ভারত এক অভিনব বৈচিত্র্যময় দেশ, কিন্তু আমাদের সকলেরই অভিন্ন মাতৃভূমির প্রতি গভীর ভক্তি ও আনুগত্যের ভাবনার দ্বারা অনুপ্রাণিত ভ্রাতৃত্ববোধ ও মমত্ববোধের এক অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে দেশবাসীকে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে।"

ক) "জাত-পাত তথা উপাসনা-পদ্ধতির ভিত্তিতে রাজনৈতিক সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের

বিকাশে উৎসাহদান বিপজ্জনক প্রতিপন্ন হবে, কিন্তু সেই সঙ্গে ভারতের বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণকে ভারতমাতার প্রতি প্রকৃত অনুগত সর্ব শ্রেণীর মানুষকে এই আশ্বাস দিতে হবে যে তাদের সম্পূর্ণভাবে আইনের সংরক্ষণ দেওয়া হবে এবং সামাজিক, আর্থিক ও রাজনৈতিক সমস্ত ব্যাপারেই পুরোপুরি সমান আচরণ তাদের সঙ্গে করা হবে। আমাদের দল নিঃশর্তে এই আশ্বাস দিচ্ছে।"

খ) তিনি দেশের সুপ্রাচীন সংস্কৃতির প্রতি যথাযথ দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণের প্রয়োজনীয়তার উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি ঘোষণা করেন, আমাদের দল বিশ্বাস করে যে ভারতের ভবিষৎ ভারতীয় 'সংস্কৃতি' ও 'মর্যাদা'র সঠিক মুল্যায়ন ও প্রয়োগের উপর নির্ভর করে। ভারতের প্রকৃত পু[illegible]ন্যাগণ যেন এই ভাবনায় গর্ববোধ করে যে প্রাচীন কাল থেকে আমরা যে উত্তরাধিকার লাভ করেছি তা অত্যন্ত উদার ও চিরন্তন, তাকে কখনই বদ্ধ ও অধঃপতিত হতে দেওয়া যাবে না। স্বাধীন ভারতের ভবিষৎকে ভারতীয় আদর্শগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত রাখতে হবে এবং আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক যুগের অনুকূল প্রয়োজনমত তার সংস্কার ও পরিবর্তনও করে যেতে হবে। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যেও তার যথাযথ প্রতিফলন হওয়া আবশ্যক। আমরা যখন 'ধর্ম-রাজ্য' অর্থাৎ আইনের প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য সামনে রেখেছি, তখন আমরা ভারতীয় সংস্কৃতির সর্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহ্য পরম্পরাকেই পালন করে চলি যা সমস্ত মানুষকে প্রকৃত মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করে।"

গ) "জনসাধারণের অর্থনৈতিক অবস্থার অবনতির সব থেকে গুরুতর সমস্যা" সম্পর্কে তিনি বলেন যে তাঁর দল সর্বোদয়ের প্রকল্পের অনুসরণে একটি 'সুপরিকল্পিত বিকেন্দ্রিত জাতীয় অর্থনৈতিক যোজনা' তৈরি করতে চায়। "আমাদের দল কয়েকটি মাত্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠী ও শিল্প-সংস্থার হাতে অর্থনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণের বিরোধী। বেসরকারী সম্পত্তির অধিকার রক্ষা করা হবে। এবং জাতীয় কল্যাণের পরিপ্রেক্ষিতে বেসরকারী শিল্প-বাণিজ্যকে ন্যায়সঙ্গত ও পর্য্যাপ্ত সুযোগ দেওয়া হবে। জনস্বার্থে যখন যেমন প্রয়োজন হবে সেইমত সরকারী মালিকানা ও সরকারী নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করা হবে। দল ক্রমশঃ বিনিয়ন্ত্রণের নীতি গ্রহণ করে চলবে। সামাজিক ও অর্থনৈতিক শোষণকে অবশ্যই বন্ধ করতে হবে, ন্যায়সঙ্গত ও সমান বিতরণের ব্যবস্থা করতে হবে এবং এমন আবহাওয়া সৃষ্টি করতে হবে যাতে সকলে সম্মিলিতভাবে বর্ধিত উৎপাদনের জন্য কাজ করতে পারে।"

ঘ) ভারতের বিদেশ নীতি সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী ছিল এইরকম যে "তা হবে আরো বাস্তব-সম্মত, যেখানে আমাদের দেশের স্বার্থের কথা বিবেচনা করতে হবে সবার আগে এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শান্তি ও শুভেচ্ছা রক্ষা করতে হবে।" তিনি ঘোষণা করেন, "আমরা গণতন্ত্র ও নাগরিক স্বাধীনতায় বিশ্বাস রাখি। আমরা সর্বপ্রকার স্বৈরতন্ত্রের বিরোধী। আমরা মনে করি যে প্রত্যেক রাষ্ট্রের স্বয়ং নিজের জনগণের মধ্যে ও পরম্পরার ভিত্তিতে তার জাতীয় নীতি এবং জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তোলার অধিকার অবশ্যই থাকা উচিত।

বিশ্বের প্রতি ভারতের বাণী হল 'বেঁচে থাকো ও বাঁচতে দাও' এই তত্ত্ব। যতক্ষণ পর্যন্ত ভারতের নিজস্ব আদর্শ অনুযায়ী কাজ করতে বাধা সৃষ্টি না করা হবে, ততক্ষণে অন্য সমস্ত দেশের সঙ্গে আমাদের বন্ধুত্বের সম্পর্ক বজায় না রাখার কোন কারণ নেই।

ঙ) ভারতের কমনওয়েলথের মধ্যে অবস্থানের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করার পক্ষে তিনি মত প্রকাশ করেন, কারণ ''গ্রেট ব্রিটেন পাকিস্তানের প্রতি বিচিত্র পক্ষপাতিত্বের নীতি গ্রহণ করেছে।''

চ) পাকিস্তানের ব্যাপারে তাঁর অত্যন্ত সুনির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী ছিল। তিনি ঘোষণা করেন, ''আমাদের অভিমত হল যে ভারতের বিভাজন এক মর্মন্তুদ মূর্খতার নিদর্শন। এর দ্বারা কোন উপকারই হয়নি এবং অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক অথবা সাম্প্রদায়িক কোন সমস্যারই সমাধান হয়নি। আমরা পুনরায় অখণ্ড ভারতের লক্ষ্যে বিশ্বাস রাখি। আমরা শান্তিপূর্ণ উপায়ে উভয় রাজ্যের জনগণের এই লক্ষ্য পূরণ চাই যে এইরূপ পুনর্মিলনেই সমস্ত জনসাধারণের অস্তিত্ব যতদিন থাকবে ততদিন তাদের সঙ্গে কঠোর আদান-প্রদানের নীতি চালিয়ে যাওয়ার আমরা আবেদন জানাব। আমাদের দল দেশ বিভাজনের পর পাকিস্তানের সংখ্যালঘুদের এবং উদ্বাস্তুদের সম্পত্তির উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করতে চায়, যে সমস্যাগুলিকে কংগ্রেস সরকার সুপরিকল্পিতভাবে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। এই সমস্যাগুলির প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী একেবারেই সাম্প্রদায়িক নয়। এগুলি প্রধানতঃ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক এবং সংশ্লিষ্ট দুইটি রাজ্যের মধ্যে ন্যায়সম্মত ও সোজাসুজি উপায়ে এইগুলির সমাধান করতে হবে।''

ছ) যে কাশ্মীরের সমস্যাটি ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক দিগন্তে বিশাল আকারে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল, তার বিষয়ে তিনি ঘোষণা করেন, ''আমাদের দল মনে করে যে রাষ্ট্রসংঘ থেকে মামলাটি প্রত্যাহার করা উচিত এবং জনমত যাচাই-এর আর প্রশ্নই থাকা উচিত নয়। কাশ্মীর ভারতের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ এবং তাকে অন্য সব রাজ্যের মতই গণ্য করা উচিত।''

মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার পায়ে আত্মসমর্পণ করে জনসঙ্ঘের নিন্দা ঃ নেহরুর চূড়ান্ত ভণ্ডামি

শ্রী নেহরু তাঁর বিরুদ্ধে ও জনসংঘের বিরুদ্ধে যে সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগ উত্থাপন করেছেন তাকে খণ্ডন করে ডঃ মুখার্জী বলেন, ''মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার বেদীমূলে বার বার ভারতীয় রাষ্ট্রীয়তাকে বলি দিয়ে, এবং দেশ-বিভাগের পরেও পাকিস্তান সরকারের খামখেয়ালিপনা ও চিৎকারের সামনে আত্মসমর্পণ করার পর অন্যদের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগ উত্থাপন করা শ্রী নেহরুর মুখে একেবারেই মানায় না। ভারতে শ্রী নেহরু ও তাঁর বন্ধুরা আগাম নির্বাচনে ভোট জয় করার লালসায় যে মুসলিম তোষণের নীতি চালিয়ে যাচ্ছেন, সেটা ছাড়া কোথাও কোন সাম্প্রদায়িকতা নেই। আজ আমাদের দেশে প্রাদেশিকতা এবং জাত-পাতের নানা ভেদাভেদ আছে। আসুন আমরা সবাই মিলে এই পাপগুলি দূর করার জন্য সচেষ্ট হই, যাতে ভারতে এক বাস্তবিক গণতন্ত্রের ভিত্তি স্থাপন করতে পারি।

সাম্প্রদায়িকতার ধূয়া তুলে শ্রী নেহরু দেশের আসল সমস্যাগুলিকে পাশ কাটাতে চাইছেন। আজ দেশের সামনে যে সমস্যাগুলি রয়েছে সেগুলির সম্পর্ক ক্ষুধা, দারিদ্র্য, শোষণ, কুশাসন, দুর্নীতি, পাকিস্তানের কাছে নির্লজ্জ আত্মসমর্পণের সঙ্গে রয়েছে, এবং এগুলির জন্য প্রধান দায়িত্ব কংগ্রেস ও তার অধীনস্থ সরকারের উপরেই ন্যস্ত হয়েছে।"

জনসাধারণের প্রতি আবেদন

তাঁর এই উল্লেখযোগ্য ভাষণের শেষে তিনি তাঁর নূতন সংগঠনের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস ব্যক্ত করে বলেন যে, এই সংগঠন দেশের সমস্যাগুলির সমাধান করবে এবং তিনি এর সাফল্যের জন্য জনসাধারণের নিকট আবেগমথিত আন্তরিক আহ্বান জানান। তিনি বলেন "আমরা সম্পূর্ণ আস্থা, আশা ও সাহসের সঙ্গে আমাদের কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করছি। আমাদের কার্যকর্তারা যেন সর্বক্ষণ একথা মনে রাখেন যে শুধুমাত্র সেবা ও ত্যাগের মাধ্যমেই আমরা জনসাধারণের বিশ্বাস অর্জন করতে সক্ষম হব। স্বাধীন ভারতকে পুনরুজ্জীবিত ও পুনর্গঠিত করার যে মহান্ ব্রত আমরা গ্রহণ করেছি তার জন্য সকলে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। ভারতমাতা শ্রেণী, ধর্মমত বা জাত-পাত নির্বিশেষে তাঁর সমস্ত সন্তানদের তাঁর নিকটে আসার ও তাঁর সেবা করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছেন। আজ যত ঘন অন্ধকার কালো মেঘই ঘনিয়ে আসুক না কেন, আগামী দিনে ভারতকে এক মহান্ ব্রত উদ্‌যাপন করতে হবে। আমাদের দলের ক্ষুদ্র মাটির "প্রদীপ"-এর প্রতীক নিয়ে আমরা যেন আসন্ন নির্বাচনগুলিতে এই আশা ও ঐক্যের, বিশ্বাস ও সাহসের 'আলোক' নিয়ে এগিয়ে যেতে পারি এবং দেশের চতুর্দিকে যে ভয়ানক অন্ধকার ঘনিয়েছে তাকে যেন দূর করতে সক্ষম হই। আমাদের যাত্রা হল শুরু, এখন হে কর্ণধার, আমরা যেন সঠিক পথে, ভীতি বা প্রলোভনকে জয় করে শক্তি ও দৃঢ় সংকল্প নিয়ে এগিয়ে যেতে পারি, সেই আশীর্বাদ প্রদান করুন, যাতে ভারতকে আধ্যাত্মিক ও পার্থিব বৈভবে বিরাট ও শক্তিশালী করে তুলতে পারি, যাতে বিশ্বের শক্তি ও সমৃদ্ধি রক্ষায় ভারত উপযুক্ত ও সৌম্য উপকরণে পরিণত হতে পারে।"

একই দিনে অপরাহ্নে এক বিশাল জনসভা গান্ধী ময়দানে অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সভায় ভাষণ দিতে গিয়ে ডঃ মুখার্জী স্মরণ করিয়ে দেন যে এই দিনই—২১শে অক্টোবর নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু আজাদ হিন্দ ফৌজ (Indian National Army) শুরু করেছিলেন। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে ভারতীয় জনসংঘ মাতৃভূমির সেবায় আজাদ হিন্দ বাহিনীর সংগ্রামী ঐতিহ্য বহন করে এগিয়ে যাবে। শ্রী নেহরুর জনসংঘকে ধ্বংস করার হুম্‌কির উল্লেখ করে বিপুল জয়ধ্বনির মাঝে শ্যামাপ্রসাদ ঘোষণা করলেন, "আমি বলছি, আমি এই ধ্বংস করার মনোবৃত্তিকেই ধ্বংস করব" (I say, I will crush this crushing mentality)। সূত্র ঃ ভারত কেশরী ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়—অধ্যাপক বলরাজ মাধোক (অনুবাদ—জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়)

প্রথম লোকসভায় নির্বাচিত ঃ বিরোধী দলের অঘোষিত নেতা

শ্যামাপ্রসাদ ১৯৫২ সালের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন। এই সময়ে ভারতের নানা প্রদেশে তিনি বক্তৃতা করেন। এমনকি নেহরুর চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে তিনি দলের শক্তি প্রমাণে অগ্রসর হন। দক্ষিণ কলকাতা কেন্দ্র থেকে তিনি কংগ্রেস ও কম্যুনিস্ট প্রার্থীদের বিপুল ভোটে পরাজিত করে লোকসভায় নির্বাচিত হন।

১৯৫২. সালেই পাকিস্তান সর্ম্পকে দৃঢ় নীতি অনুসরণের জন্য পার্লামেন্টের ভিতরে ও বাহিরে চেষ্টা। রেলওয়ে পুনর্বিন্যাসের বিরুদ্ধে সাধারণ ধর্মঘটের আহ্বান। "পূর্ববঙ্গ দিবস" উদ্‌যাপন। পার্লামেন্টে জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট নামে নূতন বিরোধী ব্লকের প্রতিষ্ঠা। এবং বিরোধী দলের অঘোষিত নেতা বলে স্বীকৃত।

রেল পুনর্বিন্যাসের প্রতিবাদ-আন্দোলনে নেতৃত্ব

১৯৫২ সালের ৭ই এপ্রিল তারিখে রেল পুনর্বিন্যাসের প্রতিবাদে ডঃ শ্যামাপ্রসাদের নেতৃত্বে সংযুক্ত সংগ্রাম পরিষদের পরিচালনায় ভারতবর্ষের প্রধানতম নগরী ও ব্যবসাকেন্দ্র কলকাতায় ও অন্যত্র নাগরিকগণের পূর্ণ হরতাল উদ্‌যাপিত হয়। সেদিন তাঁহার ব্যক্তিত্ব ও নেতৃত্বের আর একবার প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে কলকাতায় ইতিপূর্বে আর কোন উপলক্ষে জনতা ও রাজনৈতিক দলসমূহকে এত সঙ্ঘবদ্ধ ও শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে আত্মপ্রকাশ করতে দেখা যায় নাই। তাঁহার নেতৃত্বে সেদিন একদিকে হরতাল ও ধর্মঘটের দৃঢ়তা এবং অন্যদিকে শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদের যে ঝড় উঠেছিল, তাহা কলকাতায় জঙ্গী আন্দোলনের বহু গৌরবময় দিনকে ম্লান করে দিয়েছিল।

ভ্রাম্যমান সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি ঃ
রাজনীতি ও সাহিত্য-সংস্কৃতিতে সম-অংশীদার

১৯৫২ সালে তাঁর ব্যস্ত কর্মসূচীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য নভেম্বর মাসে সাঁচিতে বৌদ্ধ স্মারকচিহ্নগুলির সংরক্ষণ উৎসবে যোগদান। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ব্রহ্ম, কম্বোডিয়া প্রভৃতি দেশ পরিভ্রমণ। কটকে নিখিল ভারত বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলন ও কানপুরে ভারতীয় জনসঙ্ঘের সম্মেলনে সভাপতিত্ব।

দ্বাদশ অধ্যায়

ডাক এলো জম্মু- কাশ্মীর থেকে ঃ হিন্দুদের ত্রাহি-ত্রাহি রব

১৯৫৩. সালে জম্মু ও কাশ্মীরের ভারত অন্তর্ভুক্তির প্রশ্নে জম্মু প্রজাপরিষদের আন্দোলনের জন্য সরকারের সঙ্গে পুনঃ পুনঃ সংঘর্ষ। জওহরলাল নেহরু ও শেখ আবদুল্লার সঙ্গে দীর্ঘ ও নিষ্ফল পত্রবিনিময়। দিল্লীর চাঁদনিচকে শোভাযাত্রার উপর নিষেধাজ্ঞা অমান্য করার জন্য গ্রেপ্তার ও কারাবরণ এবং পরে হেবিয়াস কর্পাস আবেদনে মুক্তিলাভ। লোকসভায় প্রধানমন্ত্রির সহিত কাশ্মীর প্রশ্ন লইয়া উত্তপ্ত বিতর্ক এবং পত্রবিনিময় কাশ্মীর-সম্পর্কে ডঃ মুখার্জীর মনোভাবকে কঠোরতর করে। লোকসভা কক্ষে ইতঃপূর্বে বহুবার প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে অন্যান্য বিষয়ে ডঃ মুখার্জীর মতভেদ হয়, কিন্তু কাশ্মীর প্রশ্নেই এই মতভেদ বেশী তীব্র আকারে প্রকাশ পায়।

কংগ্রেস পয়লা নম্বরের সাম্প্রদায়িক দল—শ্যামাপ্রসাদ
দেশের ক্ষতি নেহরুর মতো দ্বিতীয় কেউ করেনি—শ্যামাপ্রসাদ

ডঃ মুখার্জী ও তাঁর দলের বিরুদ্ধে শ্রী নেহরু উঠতে-বসতে 'সাম্প্রদায়িকতা'র অভিযোগ ছুঁড়ে দিতেন। ডঃ মুখার্জী মনে করতেন যে দেশে একটি মাত্র দল আছে যে সাম্প্রদায়িকতাকে উস্কানি দিয়েছে ও তাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। সেই দল হল স্বয়ং কংগ্রেস। "গত ৩৫ বছর ধরে এই দল সাম্প্রদায়িক নেতাদের পদপ্রান্তে আত্মসমর্পণ করে এসেছে।" (১৯৫২, জানুয়ারী)। তিনি তাদের জিজ্ঞাসা করেন, " তোমরা কি সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিলে? মুসলিম লীগের সঙ্গে একটা চুক্তি করার জন্য কারা সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে শতকরা হিসাবে আসন দেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল?....সাম্প্রদায়িকতার বেদীমূলে দেশকে বিক্রী করার পর তোমরা আমাদের সাম্প্রদায়িক বলে অভিহিত করছ? এটা সত্যের অপলাপ!"

ডঃ শ্যামাপ্রসাদ তাঁর বুদ্ধিমান্ শ্রোতাদের সামনে বড় বড় জনসভাতে ইংরাজীতে ভাষণ দেবার সময় বলতেন, **"When I scan the whole course of Indian history, I do not find a single man, who has done more harm to this country than Pandit Nehru,"**

কাশ্মীরের জন্যই শ্যামাপ্রসাদের আত্মবলিদান

কাশ্মীর সমস্যার সমাধানে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ যে পরম ধৈর্য সহকারে প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুকে ও শেখ আব্দুল্লাকে যুক্তির পথ দেখাবার চেষ্টা করেছিলেন, তার তুলনা করা যায় একমাত্র ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভূমিকার সঙ্গে, যখন তিনি শাসক কৌরবদের নিকট পাণ্ডবদের প্রতি ন্যায়বিচারের অনুরোধ জানাতে চূড়ান্ত প্রচেষ্টার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। প্রজা পরিষদের আন্দোলনের সমর্থনে ডঃ মুখার্জীর প্রয়াস পাণ্ডবদের জন্য শ্রীকৃষ্ণের প্রয়াসের চেয়ে

আন্তরিকতায় এতটুকু কম ছিল না, এবং তিনি যে অসীম ধৈর্য ও দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন, তাকেও কেউ অতিক্রম করতে পারবে না।

নেহরু—আবদুল্লার ষড়ষন্ত্র

অবশেষে এক দানবের কবল থেকে কাশ্মীর রক্ষার সংকল্প নিয়ে ভারত-কেশরী ডঃ শ্যামাপ্রসাদ ১৯৫৩ সালের মে মাসে জম্মুর উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন, এবং পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ও শেখ আব্দুল্লার যোগসাজসে তাঁকে গ্রেপ্তার করে অত্যন্ত অমানবিক অবস্থায় শ্রীনগরে এক কুঁড়েঘরে বন্দী করে রাখা হল। এই মহান্ নেতা যাঁদের একচ্ছত্র স্বৈরতন্ত্রের পথের কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, তাঁকে অপসারণ করার অতীব হীন চক্রান্ত চলছিল, সে কথা তাঁর বন্দিদশার প্রথম দিন থেকেই উপলব্ধি করা যাচ্ছিল। তা না হলে, পঃ নেহরু ও ডঃ কাট্জু শ্রীনগরে ২৪শে মে অবস্থান করা সত্ত্বেও এই শ্রদ্ধেয় বন্দীর অসুস্থতার কথা জেনেও তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করার সৌজন্য ও শোভনতাটুকু দেখাবারও প্রয়োজন মনে করলেন না কেন?

শ্যামাপ্রসাদকে শেখ আবদুল্লার হেফাজতে রেখে কাশ্মীর থেকে ফিরে জহরলাল নেহরু লেডি মাউন্টব্যাটেনের উষ্ণ সাহচর্য লাভার্থে দুই মাসের জন্য লণ্ডনে পাড়ি দিলেন। বাকী কাজ এখানে শেখ আবদুল্লাই সম্পাদন করবেন।

নেহরু-আবদুল্লার পাতা ফাঁদে ঃ মরণ গুহার পথে শ্যামাপ্রসাদ

তিনি যখন অমৃতসর যাত্রা করার জন্য জলন্ধরে ট্রেনে উঠলেন, তখন ঐ কামরায় জনৈক প্রবীণ বয়স্ক যাত্রী গুরুদাসপুরের ডেপুটি কমিশনার বলে নিজের পরিচয় দিলেন। তিনি তাঁর কাছে এই তথ্য প্রকাশ করে দিলেন যে পাঞ্জাব সরকার তাঁকে পাঠানকোট যেতে দেবে না বলে মনস্থ করেছে। "আমি আমার সরকারের নিকট থেকে নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করছি যে আপনাকে গ্রেপ্তার করা হবে," তিনি বললেন।

অতএব, এটা এখন পরিষ্কার হয়ে গেল যে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হবে। বৈদ্য গুরুদত্তকে পাঠান হল তাঁকে সঙ্গ দেবার জন্য, যদি তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। তিনি একজন আপেক্ষাকৃত কম বয়স্কসঙ্গীকে সঙ্গে নিতে চাইছিলেন যিনি তাঁর ব্যক্তিগত সুবিধার দিকে লক্ষ্য রাখার সঙ্গে সঙ্গে "পরামর্শের জন্যও কাছে থাকবেন।" এরজন্য তিনি শ্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীকে চাইছিলেন।

অমৃতসর রেল স্টেশনে কুড়ি হাজারের ওপর বিশাল জনতা তাঁকে অভ্যর্থনা জানায়, যেখানে তিনি রাত্রিবাস করেন। তিনি সেখানে কার্যকর্তাদের সঙ্গে মিলিত হন এবং তাঁর পরিকল্পনার কথা তাঁদের জানান। তিনি ঘোষণা করেন যে শেখ আব্দুল্লার উত্তর ১৯৪৬ সালে মহারাজার সরকার পঃ নেহরুকে যে উত্তর পাঠিয়েছিল তারই অনুরূপ, যখন শেখ আব্দুল্লার গ্রেপ্তারের পর তিনি শ্রীনগর পরিদর্শন করে সেখানকার অবস্থা পর্যবেক্ষণ করার জন্য যেতে চেয়েছিলেন। ডঃ মুখার্জী বললেন যে তিনি জম্মু পরিদর্শন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন, শেখ আব্দুল্লা তা পছন্দ করুন আর না করুন।

১১ই মে অমৃতসর থেকে পাঠানকোটের যাত্রাও ছিল এক অবিস্মরণীয় জয়যাত্রা। প্রত্যেক স্টেশনেই হাজার-হাজার মানুষ তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে আসে। কিন্তু এই দেখে তাঁর আশ্চর্য হল যে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হল না।

যাত্রার শুরু থেকেই ছলনা ও ষড়যন্ত্রের সূত্রপাত

তিনি পাঠানকোট পৌছলে খানিক পরেই গুরুদাসপুরের ডেপুটি কমিশনার তাঁর সঙ্গে দেখা করলেন। সম্ভবতঃ তিনি সেখানে তাঁর আগেই পৌছে গিয়েছিলেন এবং ডঃ মুখার্জীকে তিনি জানালেন যে তাঁর সরকার তাঁকে নির্দেশ দিয়েছে যে তাঁকে ও তাঁর সঙ্গীদের বিনা পারমিটেই যেতে দেওয়া হবে। তবে তিনি বলেন, "যদিও আপনার সঙ্গে আপনি কতজন সঙ্গী নিয়ে যাবেন তার কোন সীমা বেঁধে দেওয়া হয়নি, তবুও আমার পরামর্শ যে আপনি মাত্র কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে যাবেন।"

এই সংবাদ শুনে ডঃ মুখার্জী বিস্মিত হলেন, কারণ ঐ একই অফিসার জলন্ধরে যা বলেছিলেন এই সংবাদ তাকে খণ্ডন করল। তিনি বুঝতে পারলেন না যে সরকার কেন তাদের পরিকল্পনার পরিবর্তন করল। তিনি তখন জানতেন না যে এমন একটি ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল যে **তাঁকে রাজ্যের অভ্যন্তরে নিয়ে যাওয়া হবে যাতে সুপ্রীম কোর্টের সুরক্ষার হাতের আওতার বাইরে তিনি চলে যাবেন।**

পাঠানকোটে তাঁকে বাস্তবিকই প্রায় রাজকীয় বিদায় সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হল। যে রাজপথ দিয়ে তাঁর জীপ গেল সেই পথের দুধারে হাজার-হাজার মানুষ হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা জানাল। তাঁর বিদায়ের ঠিক আগে এক নব্বই বছর বয়স্ক বৃদ্ধা তাঁকে নিম্নলিখিত মর্মস্পর্শী শব্দে আশীর্বাদ জানালেন ঃ "ওয়ে পুত্তর! জীতকে আবিঁ, আইওয়ান না আবিঁ।" (আমার পুত্র জয় করে ফিরে এসো, অন্যভাবে নয়।)

ডঃ মুখার্জী ও তার সঙ্গীরা রাভি সেতুর উপরে মাধোপুর চেক পোস্টে বিকেল চারটের সময়ে পৌছলেন। ডেপুটি কমিশনার ও উপস্থিত অন্য অফিসাররা তাঁকে বিদায় জানালেন এবং তাঁর যাত্রা শুভ হোক বলে শুভেচ্ছা জানালেন। কিন্তু যেই তাঁর জীপ সেতুর মাঝামাঝি পৌছল, তিনি দেখলেন কাশ্মীর পুলিশ বাহিনীর একটি দল রাস্তা আটকে দাঁড়িয়ে আছে। জীপ থামলে একজন পুলিশ অফিসার রাজ্যের চীফ সেক্রেটারীর ১০-৫-৫৩ তারিখের একটি আদেশ তাঁর হাতে ধরিয়ে দিলেন যাতে তাঁর রাজ্যে প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছিল।

পিঞ্জরাবদ্ধ ব্যাঘ্র ঃ অমানবিক ব্যবহার ও নির্যাতন শুরু

ডঃ মুখার্জী ঐ আদেশটি পাঠ করে বললেন — "আমাকে ভারত সরকার এগিয়ে যাবার অনুমতি দিয়েছে। এখন আবার কী?" "আমি কাঠুয়ার পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট," পুলিশ অফিসার উত্তর দিলেন, "এই আদেশ আপনার হাতে তুলে দেবার জন্য আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।"

"কিন্তু আমি জম্মু যেতে চাই," ডঃ মুখার্জী ঘোষণা করলেন। এর পরে ঐ পুলিশ অফিসার জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের ইন্‌স্পেক্টর জেনারেল অফ পুলিশের ১১-৫-৫৩ তারিখে জারি করা জন-নিরাপত্তা আইনে গ্রেপ্তার করার আদেশ বের করে দেখালেন। তাতে লেখা ছিল যে ডঃ মুখার্জী "জন-নিরাপত্তা ও শান্তিকে বিঘ্নিত করার মত কাজ করেছেন, করছেন এবং করতে উদ্যত হয়েছেন।"

"ঠিক আছে, আদেশটি পাঠ করে ডঃ মুখার্জী বললেন এবং জীপ থেকে নিচে নেমে দাঁড়ালেন। বৈদ্য গুরুদত্ত ও শ্রী টেকচন্দও তাঁর সঙ্গে যাওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করায় তাদেঁরও গ্রেপ্তার করা হয়। বাকি সকলকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। তখন ডঃ মুখার্জী প্রত্যাবর্তনকারী সঙ্গীদের বলেন যে তিনি মনে করেন এটা ভারত সরকার এবং জম্মু ও কাশ্মীর সরকারের মধ্যে এক ষড়যন্ত্র। তাঁদের মাধ্যমে তিনি দেশবাসীর কাছে তাঁর শেষ বার্তা পাঠালেন, "আমি জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যে প্রবেশ করেছি, যদিও এক বন্দী হিসাবে।"

প্রায় এক ঘন্টা লখনপুরে বিরতির পর ডঃ মুখার্জী ও তাঁর সঙ্গীদের একটি জীপে করে শ্রীনগরের দিকে ছুটিয়ে নিয়ে যাওয়া হল। জম্মুর জনসাধারণ তাঁর গ্রেপ্তারের সংবাদ পায়নি। তারা হাজার-হাজার সংখ্যায় তাউনি সেতুর উপরে তাদের নায়ককে স্বাগত জানাবার জন্য সমবেত হয়েছিল। অনেক রাত পর্যন্ত তারা সেখানে অপেক্ষা করে রইল। বন্ধ জীপে সন্ধ্যার সময়ে তাঁকে সেতুর উপর দিয়ে নিয়ে যাওয়া হলেও তারা কেউ তাঁকে দেখতে পায়নি।

রাত্রি প্রায় ১০টায় তিনি উধমপুর পৌঁছলেন। জীপের কষ্টকর যাত্রায় তিনি ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন এবং সেখানেই রাত্রিবাস করতে চাইছিলেন। কিন্তু তাঁকে সঙ্গে নিয়ে যে অফিসার যাচ্ছিলেন, তিনি বললেন যে বাটোটে রাত্রি যাপন করতে হবে। সেখানে তিনি রাত্রি দুটোর সময়ে পৌঁছলেন এবং অবশিষ্ট রাতটুকু সেখানে ঘুমিয়ে কাটালেন এবং পরদিন সকালেই শ্রীনগর সেন্ট্রাল জেল অভিমুখে তাঁদের নিয়ে যাত্রা শুরু হল, সেখানে বেলা প্রায় তিনটেয় তাঁরা পৌঁছলেন। সেখান থেকে তাঁর দুই সঙ্গী সহ জেল সুপারিন্‌টেণ্ডেন্ট পণ্ডিত শ্রীকান্ত সপ্রু তাঁকে নিজে নিশাতবাগে একটি ছোট কটেজে নিয়ে গেলেন। সেখানেই জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বন্দী হিসাবে চল্লিশ দিন তাঁর কাটাবার কথা।

তাঁর গ্রেপ্তারের সংবাদে সারা দেশে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ল। দিল্লীসহ অন্যান্য বহু স্থানে বিক্ষোভ প্রদর্শন ও হরতাল পালন করা হল। এর ফলে সত্যাগ্রহও এক নতুন দিক্ নির্দেশ লাভ করল। সত্যাগ্রহীরা দিল্লীতে বা পাঠানকোট গিয়ে সত্যাগ্রহ করার পরিবর্তে এখন থেকে বিনা পারমিটে জম্মুর দিকে অগ্রসর হতে শুরু করল। "জম্মু চলো" এখন থেকে এই নতুন স্লোগান তাদের কণ্ঠে ধ্বনিত হতে লাগল। ১৩ই মে শ্রী এন সি চ্যাটার্জী কাশ্মীর সরকার কর্তৃক ডঃ মুখার্জীর গ্রেপ্তারের প্রশ্ন সংসদে উত্থাপন করলেন। গুরুদাসপুরের ডেপুটি কমিশনারের নিকট হতে প্রাপ্ত সংবাদ অনুসারে ভারত সরকার তাঁকে বিনা পারমিটে জম্মু যাওয়ার অনুমতি দেওয়া সত্ত্বেও কেন তাঁকে কাশ্মীর সরকার গ্রেপ্তার করল? কিন্তু পঃ নেহরু যখন ডেপুটি

কমিশনারের ডঃ মুখার্জীর সহিত আদৌ সাক্ষাৎ ঘটার কথা অম্লান বদনে অস্বীকার করলেন, তখন আশ্চর্যের সীমা রইল না। এই অস্বীকার করার ব্যাপারে দিল্লীর এক হিন্দী দৈনিক মন্তব্য করল—"পঃ নেহরু কি মনে করেন যে ডঃ মুখার্জী এই কলঙ্কজনক মিথ্যার জবাব তলব করতে ফিরে আসবেন না?"

নির্জন কারাবাসে ঃ তিলে তিলে মৃত্যুর পথে শহীদের আত্ম বলিদান

ডঃ মুখার্জীর জীবনের শেষ চল্লিশ দিন শ্রীনগরে বন্দী অবস্থায় থাকা এবং অবশেষে ২৩শে জুন, ১৯৫৩ তারিখে শহীদের মৃত্যুবরণের কাহিনী স্বাধীন ভারতের রাজনৈতিক জীবনে এক অত্যন্ত শোচনীয় ও মর্মান্তিক ঘটনা রূপে ইতিহাসে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। এই ঘটনা ভারতে গণতন্ত্র যেভাবে পরিচালিত হচ্ছিল এবং তথাকথিত গণতান্ত্রিক শাসকদল যাঁরা গণতন্ত্রের মুখোশ পরে দেশের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন, তাঁদের চরিত্র ও আচরণের এক অতি দুঃখজনক ধারাভাষ্য।

যে কুটিরটিকে তাঁর জন্য একটি সাব-জেলে রূপান্তরিত করা হয় সেটি ডাল লেকের পাশে অবস্থিত পাহাড়ের ঢালুর উপর নির্মিত এক ক্ষুদ্র কুটির। তার প্রধান কামরাটি ১০ ফুট X ১২ ফুট মাপের যার মধ্যে ডঃ মুখার্জীকে রাখা হয়। তার পাশের দুইটি ছোট কামরায় তাঁর সঙ্গী বন্দীদের রাখা হয়। এই "বাংলোতে" চতুর্থ খাট পাতার মত জায়গা ছিল না। ১৯শে জুন পণ্ডিত প্রেমনাথ ডোগরাকে সেখানে আনা হলে তাঁর জন্য বাইরে একটি তাঁবু খাটাতে হয়। কুটির-সংলগ্ন সম্পূর্ণ প্রাঙ্গন ভর্তি ছিল ফলের গাছ ও তরি-তরকারীর ক্ষেত, যার ফলে বন্দীদের হাঁটাচলার জন্য একটি টেনিস খেলার মাঠের চেয়ে বেশী জায়গা ছিল না। শহর থেকে এই স্থানের দূরত্ব ছিল প্রায় আট মাইল। এখানে চিকিৎসার সাহায্যের জন্য কোন প্রকার ব্যবস্থা ছিল না। দরকার হলে শহর থেকে ডাক্তার ডেকে আনতে হত। কুঁড়েঘরটি থেকে একশো গজ দূরে একটি খাল ছিল এবং ওয়াটার ওয়ার্কস বিভাগের সাব-স্টেশন, যেখানে টেলিফোন ছিল। ঐ টেলিফোনটি এই নির্জন স্থানে নব-নির্মিত জেলেরও কাজে লাগত।

প্রথম দিকে শুধু একটি সংবাদ পত্র "হিন্দুস্থান টাইম্স" তাঁকে দেওয়া হত, পরে "হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ডও" দেওয়া হত। তবে সংবাদপত্রগুলি প্রায় কখনই যথাসময়ে পৌছত না। সাধারণতঃ পরবর্তী সংবাদপত্র পেতে দুই বা তিন দিন কেটে যেত। তাঁর চিঠিপত্রের সঙ্গে এই সংবাদপত্র তাঁর কাছে ব্যক্তিগতভাবে জেলের সুপারিণ্টেডেন্ট নিয়ে আসতেন। তাঁর ডাকের ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ অত্যন্ত অবহেলার ব্যবহার করতেন। তাঁর চিঠি, বিশেষতঃ বাংলায় লেখা চিঠি শ্রীনগর থেকে তাঁর কাছে পৌছতে সাধারণতঃ এক সপ্তাহ লেগে যেত। কলকাতা থেকে ১০ই জুন প্রেরিত কয়েকটি পত্র, যার উপর শ্রীনগর ডাকঘরের ১২ বা ১৩ জুনের ছাপ ছিল, সেগুলি তাঁকে পৌছে দেওয়া হয়নি এবং তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পরিবারবর্গের নিকট ফেরৎ চলে যায়।

২৪ ঘন্টা প্রহরীবেষ্টিত ঃ হাঁটাচলাতেও পুলিশের নজরদারি

তাঁকে যে প্রহরীদের চোখের সামনেও ছোট বাগানের বাইরে হাঁটা-চলার অনুমতি পর্যন্ত দেওয়া হয়নি, এই তথ্য শেখ আব্দুল্লার মানসিকতার উপর বিষন্ন আলোকপাত করে। কর্ণেল আর এন চোপড়া, ইন্সপেক্টর জেনারেল অফ প্রিজন্স ডঃ মুখার্জীর শ্রীনগরে আসার কয়েকদিন পরে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, তাঁর জন্য তিনি কি কিছু করতে পারেন, তার উত্তরে ডঃ মুখার্জী বলেন যে তিনি তাঁর প্রাতঃভ্রমণের অভাব খুব বেশী অনুভব করছেন।

" এ তো সামান্য ব্যাপার," কর্ণেল চোপড়া জবাব দেন। "আপনি খালের ধারে বেড়াতে পারেন। পুলিশ প্রহরী আপনার সঙ্গে থাকবে।"

কর্ণেল চোপড়া সেই মত সুপারিনটেণ্ডেন্টকে নির্দেশ দেন। কিন্তু পরদিন তিনি যখন প্রাতঃভ্রমণের জন্য তৈরী হয়ে বেরুলেন, তখন পুলিশ ইন্‌স্পেক্টর তাঁকে বললেন, "আমি এখনও লিখিত আদেশ পাইনি, এবং তার অপেক্ষায় আছি।" তিনি ২০শে জুন পর্যন্ত লিখিত অনুমতি পাননি, সে সময়ে ডঃ মুখার্জীর নড়া-চড়া করার মত অবস্থাও ছিল না।

পরে জানা গেল যে শেখ আব্দুল্লা সুস্পষ্ট আদেশ দিয়ে রেখেছিলেন যে তাঁর পরিষ্কার নির্দেশ আদেশ ব্যতীত ডঃ মুখার্জীকে যেন কোন রকম সুযোগ সুবিধা না দেওয়া হয়।

পুত্র পরিজনের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে নিষেধাজ্ঞা

তিনি কারাগারে থাকাকালীন তাঁর কোন বন্ধু বা আত্মীয়কে তাঁর সঙ্গে দেখা করার অনুমতি দেওয়া হয়নি। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীনগরে গিয়ে পিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার অনুমতি প্রার্থনা করে আবেদন জানিয়েছিলেন। কিন্তু নতুন দিল্লীর পারমিট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ তাঁকে জানান যে তাঁকে শ্রীনগরে গিয়ে তাঁর পিতার সঙ্গে দেখা করার অনুমতি দেওয়া যাবে না। তাঁর কয়েকজন আত্মীয় সেই সময়ে শ্রীনগরে ছিলেন, কিন্তু তাঁরা তাঁর সঙ্গে দেখা করার অনুমতি চাইলে তাঁদেরও অনুমতি দেওয়া হয়নি। সংসদ সদস্য সরদার হুকুম সিং, যাঁর পরিদর্শন ছিল পুরোপুরি রাজনৈতিক, এবং তাঁর আইনজ্ঞ হিসাবে ব্যারিস্টার ইউ এম ত্রিবেদী, এম পি, ব্যতীত একমাত্র যে ব্যক্তিকে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে দেওয়া হয় সে ছিল এক অর্ধ-উন্মাদ সাধু, যার অর্থহীন প্রলাপ শুনতে তাঁকে বাধ্য করা হয়। সম্ভবতঃ তাঁর মৃত্যুর পর বিশ্বকে একথা দেখানোর জন্য এরকম করা হয়েছিল যে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

যে কথা আগেই বলেছি, শ্রীনগরে বন্দী হবার পর থেকেই ডঃ মুখার্জীর খিদে কমতে শুরু করে। তাঁর ডান পায়ে তীব্র ব্যথা এবং ১৮ই মে থেকে সেই সঙ্গে জ্বরও শুরু হয়। এর পর আর তাঁর স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়নি।

শ্রীনগরে প্রমোদ ভ্রমণে নেহরু-কাটজু

২৪শে মে পঃ নেহরু ও ডঃ কাটজু শ্রীনগরে যান 'বিশ্রামের জন্য।' কিন্তু তাঁরা সেখানে শ্রদ্ধেয় বন্দীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার অথবা তাঁর প্রতি কী রকম আচরণ করা হচ্ছে তা জানার সৌজন্য ও শোভনতাটুকুও দেখাবার প্রয়োজন মনে করেন নি।

রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি

জুন মাসের ৩ তারিখে তাঁর পায়ের ব্যথা আবার শুরু হয়। এবং আগের চেয়ে আরো তীব্রতা বৃদ্ধি হয়। ৬-৬-৫৩ তারিখে একটি চিঠিতে তিনি লেখেন, "মোটামুটি আমি ভালই ছিলাম। কিন্তু ডান পায়ের ব্যথা দু' দিন ধরে আবার বেড়েছে। তার ওপর কদিন ধরে সন্ধ্যায় জ্বরও হচ্ছে। চোখ-মুখ জ্বালা করছে। ওষুধ খাচ্ছি।"

১২-৬-৫৩ নাগাদ এই চিঠি কলকাতায় পৌছলে ডঃ মুখার্জীর ভাই ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের সঙ্গে দেখা করেন, তাঁকে ডঃ মুখার্জীর অসুস্থতার কথা জানান এবং কাশ্মীরের সঙ্গে যোগাযোগ করার অনুরোধ করেন।

জ্বরের সঙ্গে পায়ে ব্যথা একটা নতুন উপসর্গ যা এর আগে ডঃ মুখার্জীর কখনো হয়নি। খিদে না হওয়ার দরুন প্রতিদিনই তাঁর ওজন কমছিল। ব্যারিস্টার ইউ. এম ত্রিবেদী যিনি কাশ্মীর হাইকোর্টে তাঁর হেবিয়াস কর্পাস আবেদনের সওয়াল করতে শ্রীনগরে গিয়েছিলেন। এবং যিনি জেলা ম্যজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে ১২ই জুন নির্দেশ গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছিলেন, কাশ্মীর হাইকোর্টের কাশ্মীর সরকারকে এই নির্দেশ দেবার পর যে, তিনি যেন একান্তে ডঃ মুখার্জীর নির্দেশ গ্রহণ করতে পারেন, তিনি ১৮ই জুন ৩ ঘন্টা ধরে তাঁর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন। তিনি ডঃ মুখার্জীকে খুবই দুর্বল ও নিরানন্দ অবস্থায় দেখেন।

পঃ প্রেমনাথ ডোগরাকে জম্মু থেকে ১৯শে জুন শ্রীনগরে নিয়ে যাওয়া হয়। তাঁর ভগ্ন স্বাস্থ্য ও ক্ষুধামান্দ্য দেখে তিনিও প্রচণ্ড হতাশা বোধ করেন। তিনি ডঃ মুখার্জীকে এই অবস্থার কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি জানালেন যে সম্ভবতঃ ব্যায়ামের অভাবেই এরকম ঘটেছে।

নিষিদ্ধ ঔষধ প্রয়োগ

সেই রাত্রেই তাঁর বুকে ব্যথা ও জ্বর খুব বেড়ে যায়। ২০ তারিখে সকালে কর্তৃপক্ষকে তাঁর এই অবস্থার কথা জানানো হয়। তার পর বেলা প্রায় ১১-৩০ মিঃ ডাঃ আলি মহম্মদ ও ডাঃ অমর নাথ রায়না সাব-জেলে এসে পৌছান। ডাঃ আলি মহম্মদ বিধান দেন যে ড্রাই প্লুরিসি তাঁর কষ্টের কারণ এবং স্ট্রেপ্টোমাইসিন ইঞ্জেক্শন দেবার ব্যবস্থাপত্র লিখে দেন। ডঃ মুখার্জী এর প্রতিবাদ করে জানান যে, তাঁর পারিবারিক চিকিৎসক তাঁকে স্ট্রেপ্টোমাইসিন গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন, কারণ ঐ ঔষধ তাঁর দৈহিক গঠনতন্ত্রের উপযুক্ত নয়। কিন্তু তাঁর আপত্তিতে কর্ণপাত করা হয়নি। বৈদ্য গুরুদত্ত জানান যে ডঃ মুখার্জী ঐ দিনই সুপারিন্টেণ্ডেন্টকে অনুরোধ করেন যে তাঁর অসুস্থতার সংবাদ যেন তাঁর আত্মীয়দের জানানো

হয়। কিন্তু সে রকম কোন সংবাদ পাঠানো হয়নি এবং সরকার তাঁর মৃত্যুর আগে এ বিষয়ে কোন বুলেটিনও প্রকাশ করেনি।

পর দিন, ২১শে জুন জেলের ডাক্তার একজন সাব-অ্যাসিস্টেন্ট সার্জেন ছাড়া কোন ডাক্তার তাঁকে দেখতে আসেন নি; এমন কি ডঃ আলি মহম্মদ পর্যন্ত আসেন নি। তাঁর জ্বর খুব বেড়ে যায় এবং বুকের ব্যথাও বৃদ্ধি পায়।

জীবিত শ্যামাপ্রসাদের সঙ্গে শেষ এবং মৃত শ্যামাপ্রসাদের প্রথম সাক্ষাৎকারী ইউ. এম. ত্রিবেদীর বিবৃতি

"আমি ডঃ মুখার্জির সঙ্গে আবার দেখা করি ২২ তারিখে সকাল ১০টা নাগাদ। তাঁর বন্দিশালায় যাবার আগে জেল সুপারিন্টেন্ডেন্ট আমাকে জানান যে ডঃ মুখার্জি অসুস্থবোধ করেছিলেন বলে চিকিৎসকের নির্দেশে তাঁকে নার্সিং হোমে নিয়ে যাওয়া হবে এবং তাঁকে সেখানে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। নার্সিং হোমটির নাম-ধাম প্রকাশ করলেন না। এই দিন ডঃ মুখার্জির সঙ্গে আমার সাক্ষাৎকার ১০টা থেকে ১১টা পর্যন্ত এক ঘণ্টার মত হয়।

আমি গিয়ে দেখি তিনি বিছানায় হেলান দিয়ে বসে আছেন, তবে তাঁকে বেশ প্রফুল্ল দেখাচ্ছিল। তিনি আমাকে বললেন, খুব ভোরবেলায় তিনি হয়তো মারাই যেতেন—"মেরে ভাই, পাঁচ বাজে তো চলা যাতা থা।" তাঁর অসুস্থতার গুরুত্ব কতটা তা তখনই প্রথম বুঝতে পারলাম। আমি জিজ্ঞাসা করলাম তিনি এখন কেমন বোধ করছেন। তিনি বললেন তাঁর এখন আর কোন যন্ত্রণা নেই এবং পুরোপুরি ভালই বোধ করছেন। যাই হোক, আমি খুব একটা নিশ্চিন্ত বোধ করতে পারলাম না। বললাম, কোর্টে যেতে হবে, সেজন্য আমাকে এখন চলে যেতে হচ্ছে। কিন্তু বিকেলে আবার তাঁকে অবশ্যই দেখতে যাব।

১১টা নাগাদ আমি ডঃ মুখার্জীর কাছে বিদায় নিলাম। কোর্টে যাবার পথে সুপারিন্টেন্ডেন্ট ও আর এক ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হল, তাঁরা একটি ছোট গাড়ীতে আসছিলেন। সুপারিন্টেডেন্ট আমাকে জানালেন, তিনি ডঃ মুখার্জিকে একটি নার্সিং হোমে নিয়ে যাবেন। এরপর আমি কোর্টে চলে গেলাম। সেখানে গিয়ে দেখি, কতকগুলি রেফারেন্স বই আমি হোটেলে ফেলে এসেছি। সেজন্য আমি ডঃ মুখার্জির তরুণ বন্ধু শ্রী দেওকী প্রসাদকে আমার হোটেল থেকে বইগুলি নিয়ে আসতে পাঠালাম। তখন বেলা প্রায় বারটা। দেওকী প্রসাদ ফিরে এসে আমাকে বললেন যে তিনি দেখলেন ডঃ মুখার্জিকে একটি ছোট গাড়ি করে শহরের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তিনি আমাকে একথাও জানালেন যে যেদিকে গাড়িটা যাচ্ছিল সেদিকে কোন নার্সিং হোম নেই।

নার্সিং হোমের নামে সরকারি হাসপাতালের স্ত্রী-রোগ ওয়ার্ডে

বিকেলে সওয়া পাঁচটা নাগাদ কোর্টের কাজ শেষ হলে আমি জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে যোগাযোগ করি এবং বলি যেখানে ডঃ মুখার্জিকে রাখা হয়েছে সেখানে আমাকে নিয়ে যেতে। তার আগে আমি অন্ততঃ পাঁচজন যুবককে কাছে পিঠে প্রায় সব ক'টি জানা নার্সিংহোমে

খবর নিতে পাঠিয়েছি এবং খবর পাই নার্সিং হোমগুলির কোনটিতেই ডঃ মুখার্জিকে রাখা হয়নি। ইতিমধ্যে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট নিজের গাড়িতে আমাকে ডঃ মুখার্জির কাছে নিয়ে যেতে এলেন। আমাকে নিয়ে গেলেন আমার হোটেল থেকে প্রায় ৩১/২ মাইল দূরে সরকারী হাসপাতালে। সরকারী হাসপাতালের দোতলায় স্ত্রী-রোগ সংক্রান্ত ওয়ার্ডের ১নং ঘরে ডঃ মুখার্জির কাছে আমাকে নিয়ে যাওয়া হল। আমি দেখলাম ডঃ মুখার্জি বিছানায় হেলান দিয়ে বসে আছেন। হাসিমুখ সত্ত্বেও তাঁকে খুব ফ্যাকাসে দেখাচ্ছিল। আমি তাঁকে বললাম, সকালে তাঁকে যত ভাল দেখেছিলাম এখন সে রকম লাগছে না। তিনি কিন্তু সে কথা মানতে চাইলেন না; বললেন আগের চেয়ে সুস্থবোধ করছেন। সে সময় জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তাঁকে তাঁর সমস্ত চিঠিগুলি দিলেন (গোটা পনেরো হবে)। তিনি সব চিঠিগুলি পড়লেন। তার মধ্যে একটি টেলিগ্রাম ছিল, পুনা থেকে মীরা নামের একজন পাঠিয়েছিলেন। আমি সেটি পড়ে দিলাম।

আমি তখন তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম তাঁর আত্মীয়স্বজন অথবা পুনায় হাসির কাছে কোন টেলিগ্রাম পাঠাতে চান কিনা। তিনি জানালেন তিনি ইতিমধ্যে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের মাধ্যমে তিনটি টেলিগ্রাম পাঠিয়েছেন। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আমার পাশেই দাঁড়িয়েছিলেন। তিনিও টেলিগ্রাম পাঠানো হয়েছে বললেন। আমি ডঃ মুখার্জিকে পুনরায় জিজ্ঞেস করলাম ঐ সব টেলিগ্রামে যা বলেছেন, তাছাড়া আরও কিছু জানাবার আছে কি না। তিনি বললেন, তাঁর বেশী কিছু আর জানাবার নেই এবং বিশেষ কোন চিন্তা বা উদ্বেগের কারণ নেই। সে সময়ে লিকুইডেশনে যাওয়া একটি ফার্মের কতকগুলি কাগজপত্র এসেছিল। ডঃ মুখার্জি বিছানায় উঠে বসে ফাউন্টেন পেন নিলেন ও চিঠিপত্রগুলি পড়ে ছ-সাতটি কাগজে স্বাক্ষর করলেন এবং ২টি চেকও সই করলেন।

সই সাবুদ করার পর ডঃ মুখার্জি আবার হেলান দিলেন। সে সময়ে তাঁর হাতটি হৃৎপিণ্ডের উপর রাখলেন এবং তাঁর মুখ দেখে মনে হল তিনি যন্ত্রণা বোধ করছেন। আমি তাঁর সঙ্গে কিছু এটা-সেটা কথা বললাম। সন্ধ্যা ৭-১৫ বা ৭-২০ মিনিট পর্যন্ত আমি তাঁর কাছে ছিলাম—হয়তো ৭-২৫ মিনিটেরও বেশি হতে পারে। তাঁর শারীরিক অবস্থা সম্বন্ধে আমি বড় একটা নিশ্চিন্ত বোধ করতে পারিনি। আমি ডাক্তারকে একটু দূরে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, ডঃ মুখার্জির অবস্থা সম্বন্ধে তিনি কি মনে করছেন? তিনি বললেন, ভয় পাবার মত কিছু নেই। সংকট কিছু হয়ে থাকলেও তা কেটে গেছে, পরদিন সকালে তাঁর x-ray হবে। তিনি আমাকে আরও বললেন, ২-৩ দিনের মধ্যে ডঃ মুখার্জি সুস্থ হয়ে উঠবেন।

যাই হোক, তাতেও আমি স্বস্তিবোধ করতে পারিনি, কারণ ডঃ মুখার্জির মুখচোখের চেহারা আমার ভালবোধ হচ্ছিল না। পরদিন সকালে আমি প্লেনে পাঠানকোট চলে যাবার কথা ভাবছিলাম, কিন্তু সে পরিকল্পনা বর্জন করে তাঁকে বললাম, পরদিন সকালে তাঁকে সম্পূর্ণ সুস্থ না দেখে আমি যাব না। সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা নাগাদ যখন আমি চলে আসছিলাম, তিনি আমাকে তাঁর জন্য কিছু পত্র-পত্রিকা আনতে বললেন।

আমি তখন তাঁর হাতে আমার হাত রাখলাম তাঁর জ্বর আছে কিনা দেখবার জন্য। দেখলাম তাপ স্বাভাবিক। পরদিন সকালে অবশ্যই আসব বলে বিদায় নিলাম।

শেষ খবরঃ সব শেষ

এর পর আমি ডঃ মুখার্জির খবর পাই ২৩ তারিখের খুব ভোরে পৌনে চারটে নাগাদ। পুলিশ সুপারিনটেণ্ডেন্ট আমাকে জানালেন ডঃ মুখার্জির অবস্থা কিছু গুরুতর এবং জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আমাকে হাসপাতালে তাঁর শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হতে বলেছেন।

আমি তখনই রওনা হয়ে ৪টা বাজতে ৫ মিনিটের সময় হাসপাতালে পৌঁছই। দেখলাম ডঃ মুখার্জির ঘরের দরজা বন্ধ এবং ভিজিটারদের ঘরে একজন ডাক্তার বসে আছেন। আমাকে তাঁর পাশে বসতে বললেন। কিন্তু ঐভাবে থাকা আমার পক্ষে অসহ্য বোধ হল। তাই মিনিট খানেক বসেই আমি জিজ্ঞেস করলাম, ডঃ মুখার্জি কেমন আছেন?

পুলিস সুপারিটেণ্ডেন্ট অবশ্য বললেন, অক্সিজেন দেওয়া হচ্ছে। তখন আমি বললুম, 'চলুন, আমরা ঘরের ভেতরে গিয়ে বসি, গিয়ে জিজ্ঞেস করুন আমি ভেতরে যেতে পারি কি না।'

তিনি ভিতরে গেলেন এবং একজন ডাক্তারের সঙ্গে ফিরে এলেন। ডাক্তারটি আমায় জানালেন, ডঃ মুখার্জি আমার হাসপাতালে পৌঁছনোর ৫ মিনিট আগে মারা গেছেন।

চিরনিদ্রায় ভারত কেশরী

তারপর আমাকে ঘরের মধ্যে নিয়ে যাওয়া হল। আমি দেখলাম ডঃ মুখার্জির সমস্ত দেহ বস্ত্রাচ্ছাদিত। তাঁর মুখ থেকে কাপড় সরিয়ে দেখলাম, তিনি চির-নিদ্রায় মগ্ন।

আমার আসার পাঁচ মিনিটের মধ্যে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এসে পৌঁছলেন। আমি তাঁকে জানালাম, আমি মৃতদেহ এখনই কলকাতায় নিয়ে যেতে চাই। এবং তাঁকে অবশ্যই সে ব্যবস্থা করতে হবে। এবং যদি তিনি না পারেন তাহলে অবশ্যই আমাকে ভারত সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করার অনুমতি দিতে হবে।

তিনি আমাকে কথা দিলেন যে ঐ ব্যবস্থা তিনি করতে পারবেন। তখন আমি তাঁকে ডঃ মুখার্জির পরিবারবর্গের কাছে এই সংবাদ অবিলম্বে পাঠাতে বললাম।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

সব শেষ হয়ে গেল ঃ মুখার্জী পরিবারে মর্মান্তিক সংবাদটি কেমন করে এলো

শ্যামাপ্রসাদের অনুজ উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন ঃ " সেই সময় আমি কলকাতায়। তাই সংবাদ প্রাপ্তির বিবরণ আমার জবানিতে লিখি। ২৩শে জুন, ১৯৫৩। ৭৭নং আশুতোষ মুখার্জী রোডে আমাদের পৈতৃক বাড়ি। সকাল বেলা। প্রায় পৌনে ছটা। দোতলার ভেতরের দালানে টেলিফোন বেজে ওঠে। অপারেটার জানান, শ্রীনগর থেকে জাস্টিস্ মুখার্জির (বড়দাদা, রমাপ্রসাদ মুখার্জির) নামে ব্যক্তিগত ট্রাঙ্ককল।

কাশ্মীর শ্রীনগর থেকে ট্রাঙ্ককল ! মেজদা করছেন নিশ্চয় ! বড়দা তখনি এসে ফোন ধরেন। বাড়ির যে যেখানে ছিলেন তাড়াতাড়ি এসে টেলিফোনের কাছে জড় হন্। মা একতলায় পূজার ঘরে। তাঁকেও নিয়ে আসা হয় ওপরে। টেলিফোনের কাছে এসে তিনি উৎসুক হয়ে দাঁড়ান। মুখভরা ম্লান হাসি। ছেলে কতো দূরে সেই কাশ্মীরে, তাকে বন্দী করে রেখেছে। খুশিভরা মুখে মন্তব্য করেন, নিশ্চয় এইবার ছেড়ে দিয়েছে। ছাড়া পেতেই টেলিফোন করছে,—ও তো যেখানেই যখন যায়, টেলিফোনে আমার সঙ্গে কথা বলে। টেলিফোনটা দাও, বাবা, আমার হাতে, কথা বলি—এখনি হয়ত কেটে দেবে।

ওদিকে রিসিভার কানে বড়দা কথা বলছেন। কিন্তু তাঁর মুখে হাসি নেই কেন? গম্ভীর। উদ্বিগ্ন। ইংরেজীতে বলে চলেছেন, হ্যাঁ হ্যাঁ—আমিই কথা বলছি, জস্টিস মুখার্জি।—কে? কে? কী কী! কী বললেন?—কী! —What! What!...বড়দার মুখে এই ভাবে কাটা কাটা কথা। প্রচণ্ড উত্তেজনা!

সবাই উন্মুখ হয়ে তাকিয়ে আছি বড়দার দিকে। আর মা কেবলই তাগাদা দিচ্ছেন, দাও বাবা, আমি একটু ভোতনের সঙ্গে কথা বলি। ওকে ছেড়ে দিয়েছে ত?

আমাদেরও উৎকণ্ঠার অন্ত নেই। হতবাক্ হয়ে শুনছি এ-তরফে বড়দার উত্তেজিত বিক্ষুব্ধ কণ্ঠস্বর, ওদিকের কথাগুলি কী, তখনও জানি না।

টেলিফোনে কথাবার্তা হঠাৎ শেষ। সদাশান্ত বড়দার সে কী চেহারা! স্তম্ভিত, অথচ উত্তেজিত। কিন্তু কী কারণে? সবাই উদ্‌গ্রীব। মার মুখের সেই ম্লান হাসিটুকু ও মুছে গেছে; বলেন, কী হোল বাবা, টেলিফোন ছেড়ে দিলে? আমাকে ওর সঙ্গে একটু কথা বলতে দিলে না?

বড়দা মাকে জানান, ওর শরীর ভাল নেই,—তুমি এখন নীচে চল মা, পূজা করোগে।

আমাকে ডাকেন, একপাশে নিয়ে যান্। কাঁপা গলায় বলেন, সব শেষ হয়ে গেছে যে। শুধু এই জানাল! (শ্যামাপ্রসাদের ডায়েরী ও মৃত্যু প্রসঙ্গ)

চারদিকে একটিই খবরঃ তিনি নেই, তিনি নেই

"তখন ভোর ৪-টে ৩৫ মিনিট হবে। সহকারী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী খবরটি জানাবার জন্য আগেই চলে গিয়েছিলেন। আমি (ইউ. এস. ত্রিবেদী) ৪-টে ৫০ মিনিটে হোটেলে ফিরে এলাম এবং অল ইণ্ডিয়া রেডিও, টাইম্‌স্ অফ ইণ্ডিয়া এবং ইউ. পি. আই. সংবাদসংস্থার প্রতিনিধিদের ফোন করে হোটেলে আমার ঘরে আসতে বললাম। টাইম্‌স্ অফ ইণ্ডিয়া এবং অল ইণ্ডিয়া রেডিওর প্রতিনিধিরা ৫ মিনিটের মধ্যে এসে পড়লেন। আমি তাঁদের খবরটি দিলাম। তখনও পর্যন্ত তাঁরা কিছু জানতেন না।

তারপর আমি দিল্লীতে মৌলীচন্দ্রকে টেলিফোনে ডাকার চেষ্টা করলাম, কিন্তু পেলাম না। এর পর জম্মুতে টেলিফোন করার চেষ্টা করলাম, তাও পেলাম না। অল ইণ্ডিয়া রেডিওর প্রতিনিধিটি আমায় জানালেন, তিনি এর আগে পুরো ২ ঘণ্টা ধরে চেষ্টা করেও যোগাযোগ করতে পারেন নি। ৮টা নাগাদ আমি আবার হাসপাতালে গেলাম, সেখানে সহকারী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা হল। তিনি আমায় বললেন, কলকাতায় সরাসরি ফোনে কথা বলতে পারেন নি। কিন্তু তিনি অপারেটর মারফত জাস্টিস মুখার্জিকে খবরটা জানিয়েছেন এবং দিল্লী মারফত বোম্বেতেও খবর পাঠিয়েছেন। তিনি আরও বললেন ৫টার আগেই ডঃ কাটজুর সঙ্গে তাঁর কথা হয়েছে।

ইতিমধ্যে হাসপাতালে ৫০০ জন লোক এসে সামনের গেটে জড়ো হয়েছিল। সেজন্য পিছনের দরজা দিয়ে শবদেহ বার করতে হল।"

মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ডায়েরী ও দরকারী কাগজপত্র সরিয়ে ফেলা হল

"আটটা নাগাদ আমি তাঁর জিনিসপত্রগুলি চাইলাম। তাঁর হাতঘড়ি, কলম এবং একটা সুটকেস পেলাম। অ্যাটাচি কেসটি ছিল না। সুটকেসে কোন তালা বা চাবি ছিল না। চটি জোড়া বাইরে পড়েছিল। চশমা ছিল কিন্তু তার কোন খাপ ছিল না।

আমরা এরোড্রোমের দিকে ৮.৪০ মিঃ নাগাদ রওনা হবার সময়, পুলিশ বাহিনীর ভিতরে যাঁরা হিন্দু ছিলেন—সুপারিন্টেন্ডেন্ট, ডেপুটি সুপারিন্টেন্ডেন্ট, সাব-ইনস্‌পেক্টর এবং একজন হেড কনস্টেবল তাঁরা মুসলমান কর্তৃক মৃতদেহ স্পর্শ হয় তা চান নি।

পুলিশ অফিসাররা আমায় পরামর্শ দিলেন, শবদেহ যদি স্ট্রেচারে তুলতে হয়, আমি যেন তাঁদের সাহায্য নেবার কথা বলি এবং মুসলমানদের স্পর্শ করা উচিত হবে না, এটাও যেন জানিয়ে দিই। সেজন্য আমি জেলা-ম্যাজিস্ট্রেটকে সহবন্দীদের ডাকতে বললাম। আমি আগেই তাঁদের মুক্তি দেবার জন্য বলেছিলাম। প্রেমনাথ ডোগরা, যিনি বহুদিন যাবৎ কারাদণ্ড ভোগ করছিলেন তাঁকে মুক্তি দেবার জন্যও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে অনুরোধ করলাম।"

ঘরের পথে প্রাণহীন দেহ

শবদেহ তোলার আগেই জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে এদের মুক্তির ব্যবস্থা করার জন্য বলেছিলাম; কারণ আমার মনে হয়েছিল শবদেহ তোলার জন্য অন্ততঃ দশজন লোক লাগবে। ৮-৪০ মিনিটে ঐ তিনজন সহবন্দী এসে পৌঁছলেন। কিন্তু তাঁরা আসার আগেই পুলিস ও সেনা বিভাগের অফিসারদের সাহায্যে শবদেহ বাহিরে আনা হয়। আমরা শবদেহ অ্যাম্বুলেন্স পর্যন্ত বহন করে নিয়ে গেলাম। আমরা সবাই, যারা শবদেহ বহন করেছিলাম, অ্যাম্বুলেন্সের ভেতর বসলাম। ৯টা ৫ মিনিটে আমরা এরোড্রোম পৌঁছলাম।

এরোড্রোমে মুখ্যমন্ত্রী শেখ আবদুল্লা ছাড়া আর সব মন্ত্রীই উপস্থিত ছিলেন। সে সময়ে মন্ত্রীরা সবাই তাঁদের গভীর দুঃখ প্রকাশ করেন। অর্থ-মন্ত্রী দুঃখে ভেঙে পড়েছিলেন। জেলা ম্যাজিস্ট্রেটও আবার ভেঙে পড়েন। সকাল ১০টা ১৫ মিঃ নাগাদ মুখ্যমন্ত্রী এসে পৌঁছলেন।

ভারত সরকারের বর্বরোচিত আচরণ ঃ মৃতদেহ বহনে বিমান দানে বাধা সৃষ্টি, মৃতদেহবাহী বিমান দিল্লীতে যেন না নামে, কলকাতায় যেন দিনের বেলায় না পৌঁছায় সে ব্যবস্থা করতে হীন অপকৌশল ও মৃত শ্যামা প্রসাদকে নেহরু চক্রের ভয়।

এর মধ্যে ভারতীয় বিমান বাহিনীর ডাকোটা বিমান ব্যবহার নিয়ে ভারত সরকারের কর্তৃপক্ষের কিছু বাধাবিপত্তি দেখা গেল। উইং কমাণ্ডার এবং অন্য যেসব অফিসার সেখানে ছিলেন, তাঁরা সাহায্য করতে আগ্রহী ছিলেন এবং বিমান বাহিনীর হেড কোয়ার্টার থেকে আদেশের অপেক্ষা করছিলেন। প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের শ্রী বি. বি. ঘোষকে ফোন করা হল, কিন্তু তাঁকে পাওয়া গেল না। প্রায় আধঘণ্টা ধরে দিল্লী হেড কোয়ার্টাস্ থেকে কেবল নিষেধাত্মক আদেশই আসতে থাকল।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তখন সহকারী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে ডঃ কাট্জুর সঙ্গে যোগাযোগ করতে বললেন।

যখন ডঃ কাট্জুকে পাওয়া গেল, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নিজে তাঁর সঙ্গে দশ মিনিট ধরে কথা বললেন এবং ডঃ কাটজুকে তখনই উইং কমান্ডারের সঙ্গে কথা বলতে বললেন এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রক থেকে ভারতীয় বিমান বাহিনীর ডাকোটা বিমানটি ব্যবহার যাতে করা যায়, তার নির্দেশটি পাঠাতে বললেন। আবহাওয়া খুবই খারাপ ছিল। অসামরিক বিমান চলাচল বন্ধ ছিল। ডঃ কাট্জু ডাকোটা ব্যবহার করতে দিতে ইচ্ছুক ছিলেন না।

বক্সী গোলাম মহম্মদের মানবিক ব্যবহার ঃ শেখ আবদুল্লা নির্বিকার

তখন গোলাম মহম্মদ বক্সী তাঁকে বললেন (আমি পাশেই দাঁড়িয়ে তাঁদের কথোপকথন শুনছিলাম), তাঁর এ-ব্যাপারে রাজী না হওয়া ঠিক হবে না। তখন ডঃ কাট্জু উইং কমান্ডারের সঙ্গে কথা বললেন, কিন্তু তাঁকে কি বলা হল বুঝতে পারলাম না, কারণ ঐ ফোনের পরেও উইং কমান্ডার প্লেন দিতে রাজী হলেন না। বক্সী গোলাম মহম্মদ তাঁর উপর রেগে আগুন হয়ে সমস্ত দায়দায়িত্ব নিজের ওপর নিয়ে তাঁকে আদেশ মানতে বাধ্য করালেন।

টেলিফোনে এই সব কথাবার্তা চলাকালীন শেখ আবদুল্লা এসে পৌঁছলেন। সব মন্ত্রীরা তখন স্ট্রেচার তুলতে হাত লাগালেন এবং মাল্যভূষিত করে স্ট্রেচার বিমানে তোলা হল। শেখ

আবদুল্লা একটা বিশেষ ধরনের ফুলকাটা শাল এনেছিলেন, সেটি মরদেহের উপর রাখা হল। সকাল ১০টা ৪০ মিনিটে আমরা এরোড্রাম ছাড়লাম, আমরা ধরে নিয়েছিলাম দিল্লী যাচ্ছি এবং সেখান থেকে আর একটি বিমানে কলকাতা যাব।

কলকাতায় দিনের বেলায় না পৌঁছানর জন্য মৃতদেহবাহী বিমান সারাদিন আকাশে ঘুরে বেড়িয়েছে।

কাশ্মীর রাজ্যের সীমানা পেরোবার পর পাইলটের কাছ থেকে জানলাম তাঁকে জলন্ধরে যাবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আমি বললাম আম্বালা নয় কেন? তিনি আমাকে বললেন, আম্বালায় বিমান-অবতরণের জায়গাটি ভাল নয়। কিন্তু জলন্ধরে পৌঁছে তিনি অবতরণ করবার কোন নির্দেশ পেলেন না। তিনি রেডিও মারফত নির্দেশ পাবার চেষ্টা করলেন কিন্তু সফল হলেন না। জলন্ধরের আকাশে আমরা পৌঁছেছিলাম সাড়ে বারোটায়। আধঘণ্টা জলন্ধরের উপর চক্কর দিয়ে দক্ষিণে ৫০ মাইল চলে গিয়ে আবার জলন্ধরের উপর উঠে এলাম। ফের জলন্ধর ছেড়ে আদমপুর বিমানবন্দরে এসে ২ টোর সময় নামলাম।

২টোর সময়ে যখন নামলাম তখন সেখানে I N A প্লেনের পাইলটের সঙ্গে দেখা হল। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম তিনি সেখানে কেন? তাঁর দিল্লীতে যাবার কথা। তিনি দুঃখ প্রকাশ করে বললেন, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তাঁকে এখানে থেকে আমাদের নিয়ে যেতে বলেছেন। তাঁকে তেল ভর্তি করতে হবে—কোথায় তিনি জানেন না—তারপর কলকাতা রওনা হবেন। আমরা দুপুর আড়াইটেয় আদমপুর ছেড়ে কানপুর সামরিক বিমানবন্দরে নেমে তেল ভর্তি করার পর বিকেল সাড়ে পাঁচটায় ফের রওনা হলাম। কানপুরে আমরা সেখান থেকে কলকাতার দূরত্ব হিসেব করে দেখলাম আমাদের তখনও ৫৬০ মাইল পথ উড়ে যেতে হবে। অফিসারটি আমাকে বললেন রাত নটার আগে কলকাতা পৌঁছানো যাবে না।

সূত্রঃ ১) ভারত কেশরী শ্যামাপ্রসাদঃ সুশান্তকুমার সাহিত্যরত্ন

২) ভারতকেশরী ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়—অধ্যাপক বলরাজ মাধোক

তখন কলকাতায়—"অনাথ হয়ে গেল বাংলা, অনাথ হয়ে গেল ভারত"

"অনাথ হয়ে গেল সমস্ত বাংলা, অনাথ হয়ে গেল সমস্ত ভারত। তাই তো লাখো মানুষের ঢল দেশের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত। রিভলভার উঁচিয়ে রাস্তায় নেমেছে জম্মুর পুলিশ। দাবি একটাই, অপরাধীদের শাস্তি দিতে হবে। লাখো মানুষের মিছিল বেরিয়েছে দিল্লীর বুকে। বেদনার জ্বালা রূপান্তরিত হয়েছে ক্রোধাগ্নিতে। রক্তের বদলে রক্ত চাই, চোখের বদলে চোখ। পাঞ্জাবে শোকাপ্লুত ক্রুদ্ধ জনতা বিমান বন্দরের দখল নিয়ে নিয়েছে। অজস্র মানুষের বাঁধভাঙ্গা ঢল নেমেছে কলকাতার রাজপথে। শালিমার রেল ইয়ার্ডের শ্রমিকরা তাঁদের বেতন প্রত্যাখ্যান করে চলে এসেছেন মহামিছিলে যোগ দিতে।

জনসঙ্ঘ অফিসে থিক থিক করছে মানুষ। চেনা-অচেনা, জানা-অজানা অসংখ্য মানুষের ভিড় সেখানে। ভিড় জমেছে বৌবাজারে হিন্দু মহাসভার সদর দপ্তরে। উন্মুখ জনতা জানতে

চাইছে, যে খবর 'রটে গেল ক্রমে' তা সত্যি কি না? বাইরের ভিড় ঠেলে ভেতরে ঢুকতেই দেখা হল নরেশচন্দ্র গাঙ্গুলীর সঙ্গে। ফোনে আপ্রাণ চেষ্টা করছেন দিল্লী অফিসের সাথে যোগাযোগ করার। শেষ আশা, যদি ওরা বলে এই খবর ভুল। পাশেই মাথা নিচু করে বসে আছেন কেশব চক্রবর্তী। সমস্ত অফিসে যেন শ্মশানের নীরবতা, সকলেই নির্বাক, বিমূঢ়, বিহ্বল। সবাই উৎকণ্ঠায় বসে আছেন—কি খবর জানাবে দিল্লী অফিস।

কিছুক্ষণ পরেই ফোন ছেড়ে বেরিয়ে এলেন নরেশচন্দ্র গাঙ্গুলী। উৎকণ্ঠিত জনতার দিকে তাকিয়ে কিছু বলতে চাইলেন। গলা কেঁপে উঠল, "হ্যাঁ, যে খবর শুনেছেন তা সত্যি। ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কাশ্মীরের জেলে মারা গেছেন। বিমানে ওঁর মৃতদেহ কলকাতায় আনা হবে।"

সবাই দমদম মুখীঃ সংবাদপত্রের প্রতিক্রিয়া

রাস্তায় মানুষের ঢল নেমেছে। বাঁধ-ভাঙ্গা স্রোতের মতো অজস্র মানুষ চলেছে দমদম বিমানবন্দরের পথে। ঝড়ের বেগে ছড়িয়ে গেছে দুঃসংবাদ। 'বিদ্রোহী বাঙলার ঐতিহ্যবাহক ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের কাশ্মীর নির্বাসনকালে মৃত্যু হয়েছে।' তাই মানুষ চলেছে প্রিয় নেতাকে শেষবারের মতো শ্রদ্ধা জানাতে। অফিস-আদালত-দোকান বন্ধ করে মানুষ ছুটছে এই মহা মিছিলে যোগ দিতে। এই নিদারুণ শোকে কিভাবে উত্তাল হয়েছিল কলকাতা তা আজও ধরা আছে সেদিনের সংবাদপত্রের পাতায় পাতায়।

"বিদ্রোহী বাংলার ঐতিহ্যবাহক ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের কাশ্মীরে নির্বাসনকালে মৃত্যু হইয়াছে এই সংবাদ কেবল মুখোপাধ্যায়ের পরিবারের একটি সুন্দর প্রভাতকে ভাঙিয়া দিয়াছে তাহা নহে, কলকাতার অধিবাসীগণকেও ইহা অসহ্য আঘাতে বিহ্বল করিয়া দিয়াছে।

ডঃ মুখোপাধ্যায়ের অগ্রজ বিচারপতি রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মঙ্গলবার অতি প্রত্যূষে সর্বপ্রথম এই দুঃসংবাদ শ্রবণ করেন। কাশ্মীর হইতে কোন এক সরকারী মুখপাত্র টেলিফোনযোগে জানান যে ডঃ মুখোপাধ্যায় পরলোক গমন করিয়াছেন।

জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবনে তখনও এই আঘাত প্রতিধ্বনিত হয় নাই। ডঃ মুখোপাধ্যায় সোমবার শেষ রাত্রে ৩-৪০ মিনিটে মারা যান। কলকাতায় সম্ভবতঃ মুখোপাধ্যায়ের পরিবারই প্রথম সংবাদ পান। সকাল সাড়ে সাতটায় অল ইণ্ডিয়া রেডিওর বাঙলা সংবাদে ইহার কোন উল্লেখ হয় নাই।

সকাল দশ ঘটিকার মধ্যে ডঃ মুখোপাধ্যায়ের বাসভবনের সামনে এক বিরাট জনতা সমবেত হয়। ভবনের প্রবেশ পথের সম্মুখে শ্রীনগরে ডঃ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু এবং তাঁহার মৃতদেহ বিমানযোগে কলকাতায় আনা হইতেছে এই সংবাদ টাঙ্গাইয়া দেওয়া হইয়াছিল।

ইহার পর সংবাদপত্রগুলির বিশেষ প্রভাতী সংস্করণ মারফৎ কলকাতার সমস্ত জনসাধারণ এই নিদারুণ সংবাদ জানিতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে কলকাতার সকল কাজ যেন স্তব্ধ হইয়া যায়। কাহাকেও বলিতে হয় নাই। যাহারা সারাদিনের প্রত্যাশায় সবে বিপনি সাজাইয়াছিল, তাহারা

উহা বন্ধ করিয়া দেয় এবং যাহারা বিপনি খুলিতে যাইতেছিল তাহারা তাহা অবরুদ্ধ রাখিয়া ডঃ মুখোপাধ্যায়ের বাসভবনের দিকে যাত্রা করে। দেখিতে দেখিতে সকল দোকানপাট, বাজার বন্ধ হইয়া যায়। বাস, ট্রাম কিছুক্ষণ চলিয়া গতিরুদ্ধ হয়। পায়ে পায়ে হাঁটিয়া দলে দলে অগণিত অসংখ্য লোক ডঃ মুখোপাধ্যায়ের বাসভবনের সন্মুখে সমবেত হইতে থাকে। তাহাদের প্রিয়তম নেতা বাঙালার দুলাল কাশ্মীরে নির্বাসনকালে অকস্মাৎ মারা গিয়াছেন, তিনি এই বাসভবনে জাগ্রত জীবনে আর ফিরিয়া আসিবেন না ইহা জানিয়াও শোকে, আন্তরিক উৎকণ্ঠায় এখানে আসিতে লাগিল। যাহারা পারিল উপরে উঠিয়া আসিল। যাহাদের পক্ষে তাহা দুঃসাধ্য হইল তাহারা দূরে দাঁড়াইয়া এই ভবনের দিকে তাকাইয়া রহিল। এই বিরাট জনতায় ধনী, দরিদ্র, বৃদ্ধ, তরুণ, কিশোর মিশিয়া গিয়াছে। কলকাতার বিশিষ্ট ব্যক্তি ও অভিজাতবর্গের মধ্যে কে যে আসেন নাই তাহা বলা কঠিন। অতি সাধারণ অখ্যাতনামা ব্যক্তিরাও কেহ বাদ পড়িয়াছেন কিনা বিপুল জনতার দিকে চাহিয়া তাহাও বলা দুষ্কর। বিপুল জলোচ্ছ্বাসের মতো রাস্তার দুইপ্রান্তে জনপ্রবাহ আছে বটে, কিন্তু গৃহ সন্মুখে জনসমাবেশের গভীরতা হ্রাস পাইবার লক্ষণ নাই।

অফিস আদালত সবকিছু বন্ধ হইয়া যায়। প্রমোদ অনুষ্ঠান ভবনগুলির দ্বার সারাদিনের জন্যে রুদ্ধ হয়। সারা কলকাতা এক গভীর শোকাচ্ছায়ায় নিমজ্জিত হয়। এইদিন আকাশে একবারও রোদ ফুটিয়া উঠে নাই। আকাশ সারাদিন মেঘাচ্ছন্ন ছিল। প্রকৃতি কাঁদিয়াছে।

ডঃ মুখোপাধ্যায়ের বাসভবনে অনেক বয়স্ক বিশিষ্ট ব্যক্তিও উচ্চস্বরে কাঁদিয়াছেন; অপরিচিত ব্যক্তির চোখে অবিরাম অশ্রু। কেমন করিয়া জনসাধারণের চিত্তে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ এমন দৃঢ়ভাবে আসন প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন?" (আনন্দবাজার পত্রিকা—২৪-৬-১৯৫৩)

সেই দমদম বিমান বন্দর। সেই নিয়নলাইটের আলো। সেই বিমান ওঠা নামার একঘেয়ে শব্দ—সবকিছু তেমনি আছে! জড়ের প্রাণ নেই। হিমশীতল মৃত্যুর স্পর্শ অনুভব করার সামর্থ্য নেই জড়ের।

মাত্র দু'মাস আগে হাজার হাজার মানুষ সেদিন জড়ো হয়েছিল দমদম বিমান বন্দরে। এক মহান নেতাকে অভিনন্দন জানাতে। মহৎ এক কর্মযজ্ঞে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য দিল্লী রওনা হয়েছিলেন ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। বিমান বন্দর কাঁপিয়ে হাজারো কণ্ঠে স্লোগান উঠেছিল, 'শ্যামাপ্রসাদ তুম্ আগে বারো, হ্যাম্ তুমারা সাথ্ হ্যায়', অভিনন্দন আর সম্বর্ধনায় আপ্লুত শ্যামাপ্রসাদ ঘোষণা করেছিলেন, কাশ্মীর থেকে ফিরে এসেই ঝাঁপিয়ে পড়বেন বাংলার উদ্বাস্তু সমস্যার সমাধানে। 'ভারত কেশরী শ্যামাপ্রসাদ জিন্দাবাদ' স্লোগানে ঢাকা পড়ে গিয়েছিল বিমান ওঠা-নামার একঘেয়ে শব্দ। ২৫শে এপ্রিল কলকাতা থেকে দিল্লী উড়ে গিয়েছিলেন শ্যামাপ্রসাদ।

আজ ২৩ শে জুন। কলকাতায় ফিরে আসছেন ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। তাঁকে যে বিদায় নিতে হবে। অগণিত ছাত্র, শত সহস্র ভক্ত, লক্ষ লক্ষ অনুরাগী আজ চোখের জলের সিঞ্চনে বিদায় জানাবেন তাদের প্রিয় নেতাকে। এ তো মৃত্যু নয়। এ তো মহামরণ। এমন মৃত্যুই তো চেয়েছিলেন ভারতকেশরী। নিজের ডায়েরীতে তাই তো লিখেছেন, "কিন্তু তিলে তিলে বা ভুগে ভুগে মরতে চাই না, কাজ করতে করতে সংগ্রামের ভিতর যেতে যেতে, সত্যকে বরণ করতে করতে জীবন দীপ নিবে যাক, এই আমার কাম্য।"

নিষ্প্রাণ দেহে নির্বাক কণ্ঠে তিনি আজ গৃহাভিমুখে যাত্রা করেছেন। সমগ্র দেশের বোঝা মাথায় নিয়ে যিনি শুরু করেছিলেন তাঁর যাত্রা, সেই সিংহপুরুষ আজ চির নিদ্রায় শায়িত। যিনি দেশের মানুষের সমস্যার বোঝা যেচে নিয়েছিলেন নিজের কাঁধে, তাঁরই নশ্বর দেহের বোঝা আজ অন্যের কাঁধে।

ভবানীপুর থেকে দমদম ঃ রাস্তার দু'পাশে শুধু মানুষ আর মানুষ

লক্ষ লক্ষ মানুষ এসেছে দমদম বিমানবন্দরে। শুধু দমদম বিমানবন্দরে নয়, ভবানীপুর থেকে দমদম বিমানবন্দরের দীর্ঘ পথ আজ মানুষের দখলে। সবাই এসেছে শেষবারের মতো তাদের প্রিয় নেতাকে দেখতে। অন্তিম যাত্রায় শামিল হয়ে শ্রদ্ধা জানাতে। শ্রদ্ধায়, দুঃখে, মর্ম্মবেদনায় নির্বাক হয়ে গেছে সবাই। সংবাদপত্রের পাতায় ফুটে উঠেছে সেই ছবি—

"ডঃ মুখোপাধ্যায়ের দেহ বিমানযোগে দমদম পৌঁছবার কথা। দলে দলে লোক ছুটিল সেখানে। কখন বিমান আসিবে কেউ জানে না, তবুও বেলা ৩টা হইতেই জনস্রোত দমদম অভিমুখে বহিয়া চলিল। বাস নাই, সর্বপ্রকার সাধারণ যানবাহন চলাচল স্থগিত হইয়াছে। তবু অসংখ্য বালক, বৃদ্ধ, যুবা, পুরুষ, রমণী, বাঙালী অবাঙালী পদব্রজেই চলিয়াছে। সকলেরই গতি দমদমের দিকে। পথের মোড়ে মোড়েঅগণিত জনতা অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করিতেছে তাঁহাদের প্রিয় নেতার অন্তিম যাত্রাকে শেষবারের জন্যে একবার দেখিয়া লইবে।

ডঃ মুখোপাধ্যায়ের দেহ অপরাহ্ন তিন ঘটিকায় দমদম বিমানঘাঁটিতে পৌঁছিবে—পূর্বে প্রচারিত এক সংবাদের উপর নির্ভর করিয়া বেলা দুইটা হইতে কাতারে কাতারে লোক পদব্রজে অথবা যে কোন যানবাহনে পুষ্পমাল্য ও স্তবক বহন করিয়া দমদম অভিমুখে যাইতে থাকে। কলকাতার কয়েকজন বিশিষ্ট নেতাকেও পুষ্পমাল্য লইয়া দমদম বিমান ঘাঁটিতে অপেক্ষা করিতে দেখা যায়।

অপরাহ্ন তিনটার মধ্যে নরনারী ও শিশুর এক বিরাট জনতা দমদম বিমানঘাঁটিতে সমবেত হয়। তিনটার সময় একখানি বিমান দমদমে অবতরণ করে। উপস্থিত জনতা মনে করে ঐ বিমানে ডঃ মুখোপাধ্যায়ের মৃতদেহ আসিয়াছে। কিন্তু যখন তাহাদেরকে জানানো হয় যে, উহাতে তাঁহার মৃতদেহ নাই তখন তাহারা হতাশ হইয়া পড়ে।

কলকাতা হইতে দমদম বিমানঘাঁটি পর্যন্ত নয় মাইল দীর্ঘ পথের উভয় পার্শ্বে, গৃহের সন্মুখে ও অলিন্দে এবং পথিপার্শ্বে আগ্রহাকুল জনতা সমবেত হয় এবং দমদমের দিক হইতে আগত প্রত্যেকের নিকট ডঃ মুখোপাধ্যায়ের বিমান কখন আসিবে প্রশ্ন করিতে থাকে।

দমদম প্রত্যাগত সাংবাদিকদের গাড়ীগুলি আটক করিয়া প্রতীক্ষারত জনতা জিজ্ঞাসা করিতে থাকে, শববাহী বিমানের খবর কি আসিল? আসিল কি? তিনটা হইতে ছয়টা, ছয়টা হইতে সাড়ে সাতটা, সাড়ে সাতটা হইতে নয়টা—বিমান আসিবার সময় কেবলই পিছাইয়া যাইতে লাগিল। তথাপি এই বিরাট জনসমুদ্র প্রতীক্ষারত হইতে চ্যুত হইল না।

অবশেষে দেহ দমদমে পৌঁছিল।

রাত্রি নয়টা বাজিবার ৫ মিনিট পূর্বে ডঃ মুখোপাধ্যায়ের শবদেহ বহন করিয়া একখানি আই. এন. এ. বিমান দমদম বিমানঘাঁটিতে অবতরণ করে এবং ঠিক নয়টার সময় তাঁহার শবদেহ কলকাতার মাটি স্পর্শ করে। বেলা ৩টা হইতেই বিপুল জনতা অশেষ ধৈর্য্য সহকারে প্রতীক্ষা করিতেছিল। জনতার ভীড় এত বেশী হইয়াছিল যে বিমান অবতরণ ক্ষেত্রের প্রবেশপথে পুলিশকে এক কঠিন বেষ্টনী রচনা করিয়া শৃঙ্খলা রক্ষা করিতে হয়।

বিমানটি অবতরণ করিলে জনতার মধ্য হইতে প্রবল জয়ধ্বনি ওঠে। ডঃ মুখোপাধ্যায়ের তিন ভ্রাতা ও দুইপুত্র ধীরভাবে বিমানের ভিতর গমন করেন। ভিতরে ডঃ মুখোপাধ্যায় পুষ্পমাল্য শোভিত হইয়া অন্তিম শয্যায় শয়ন করিয়াছিলেন। একখানি শাল দ্বারা তাহার দেহ আবৃত ছিল। ডঃ মুখোপাধ্যায়ের ললাটে চন্দন এবং দেহে ইউক্যালিপ্টাস তেল ও অন্যান্য গন্ধদ্রব্য লেপন করিবার পর তাহার দেহটি স্ট্রেচারে করিয়া নামানো হয়।

দমদম বিমানঘাঁটিতে প্রতীক্ষারত জনতা ডঃ মুখোপাধ্যায়ের শবদেহে পুষ্পমাল্য অঞ্জলি দিয়া তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

সুসজ্জিত শবাধারের উপর চিরনিদ্রারত ডঃ মুখোপাধ্যায়ের দেহ যখন উঠানো হইতেছিল তখন আর জনতা আপনাকে সন্বরণ করিতে পারে নাই। গভীর শোকাবেশে অভিভূত হইয়া পড়ে।

প্রাণহীন দেহ গৃহাভিমুখে

"রাত্রি প্রায় দশটার সময় দমদম বিমানঘাঁটি হইতে এক বিরাট শোভাযাত্রা ডঃ মুখোপাধ্যায়ের শবানুগমন করিয়া কলকাতা অভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকে। শোভাযাত্রাটি যতই কলকাতার নিকটবর্তী হইতে থাকে ততই লোকে লোকে ভরিয়া যাইতে থাকে। পথের দুই ধারে অগণিত লোক, পুরুষ, নারী আবালবৃদ্ধবণিতা আকুল নয়নে ডঃ মুখোপাধ্যায়ের শবদেহের দিকে চাহিয়া থাকে। বাড়ির বারান্দা, গাছের উপর, ছাদে সর্বত্র লক্ষ লক্ষ লোক ডঃ মুখোপাধ্যায়কে শেষ বারের মতো দর্শন করিবার জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করিয়া থাকে। শ্যামবাজার মোড়ে লক্ষাধিক নরনারী গভীর রাত্রি পর্যন্ত অপেক্ষা করিয়া থাকে।"

মানুষের এই বাঁধভাঙ্গা হাহাকার জানিয়ে দিচ্ছে মানুষের মনের কত গভীরে প্রবেশ করেছেন শ্যামাপ্রসাদ। বাঙ্গালীর হৃদয়ের প্রতিটি তন্ত্রীতে ধ্বনিত হচ্ছে,—শ্যামাপ্রসাদ মরেনি, মরতে পারে না। এ অসম্ভব। সজল চোখে চপলাকান্ত ভট্টাচার্য্য প্রশ্ন করেছেন, "কেমন করিয়া জনসাধারণের চিত্তে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ এমন দৃঢ়ভাবে আসন প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন?"

বিদ্যাসাগর—রামমোহন—বিবেকানন্দ-'র উত্তরসূরী যে দু'জন বাঙ্গালী তাদের সাবলীল ব্যক্তিত্বের জোরে দেশবাসীর হৃদয়ের গভীরে প্রবেশ করতে পেরেছিলেন তাঁদের একজন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোস, অপরজন ভারতকেশরী ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। কিন্তু দু'জনের 'মৃত্যু'ই হয়েছে রহস্যজনকভাবে। তাইহকু বিমানবন্দরে এক বিমান দুর্ঘটনায় 'নিহত' হয়েছিলেন সুভাষচন্দ্র বোস। এই 'সু-সংবাদ' প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টার কোন কসুর করেননি পন্ডিত নেহরু ও তাঁর দলবল। নেহরুর সরকারই আবার বিশ্বাসযোগ্য করার চেষ্টা করেছে যে শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যু হয়েছে স্বাভাবিকভাবে। কিন্তু দেশের মানুষকে ভোলানো যায়নি। প্রশ্ন উঠেছে দেশের কোণে কোণে, "ইহা কি স্বাভাবিক মৃত্যু না রাজনৈতিক অপসারণ, না আরো নগ্ন ভাষায় হত্যা?"

শ্যামাপ্রসাদের মাতা ৮২ বছর বয়স্কা যোগমায়া দেবী তাঁর প্রিয়তম পুত্রের মৃত্যুতে প্রশ্ন করেছেন ডাঃ বিধান রায়কে, "কেমন করে ভুলতে পারি যে শ্যামা বিনা চিকিৎসায় মারা গেছে। এই তো বিধান ছিল, সে আমার শ্যামার মতো, বিধান তুমি আছো, আর আমার ছেলে বিনা চিকিৎসায় মারা গেল?" (সূত্র—শ্যামাপ্রসাদঃ ব্যর্থ বলিদান?-শান্তনু সিংহ)

শ্যামাপ্রসাদ-জননীর এই করুণ বিলাপ ও শোকে কি কোনও সান্ত্বনা আছে? ২৯ বছর পূর্বে এমনি আকস্মিক এবং অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে উপযুক্ত চিকিৎসার অভাবে সুদূর পাটনায় মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছিলেন বাংলার বাঘ স্যার আশুতোষ।

চতুর্দশ অধ্যায়

যোগমায়া দেবী ও জওহরলাল পত্রালাপ ঃ নেহরুর অপরাধী মনঃ সত্য গোপনের মিথ্যা প্রয়াস

বিনা বিচারে অন্তরীণঅবস্থায় শ্যামাপ্রসাদের অস্বাভাবিক মৃত্যুতে পশ্চিম বাংলার বিক্ষুব্ধ জনমতে আতঙ্কিত এবং কংগ্রেস সরকার ও নেতাদের প্রতি মানুষের ধিক্কার ও অপবাদে বিচলিত রাজ্য কংগ্রেস সভাপতি অতুল্য ঘোষ জহরলাল নেহরুকে এক চিঠি লেখেন। অতুল্যবাবুর চিঠির জবাব দেয়ার দু'দিন আগেই নেহরুজী শ্যামাপ্রসাদ জননী যোগমায়া দেবীকেও এক পত্র লেখেন। সে পত্র ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় মারফৎ তাঁর কাছে আসে। তারপরও যোগমায়া দেবী ও নেহরুজীর সঙ্গে একাধিক পত্র বিনিময় ঘটে। শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যুর জন্য কাশ্মীর সরকারের ইচ্ছাকৃত অবহেলা এবং ত্রুটিপূর্ণ চিকিৎসা ব্যবস্থাই দায়ী—এই স্পষ্ট ও সরাসরি অভিযোগের কোনও সন্তোষজনক জবাব না দিয়ে নেহরুজী কেবল শেখ আবদুল্লা ও কাশ্মীর সরকারের অপরাধ আড়াল করার ব্যর্থ প্রয়াস পেয়েছেন এবং কাশ্মীর সরকারের মুখপাত্র হয়ে মিথ্যা সাফাই গেয়েছেন। চিঠিগুলি পরপর পাঠ করলে এই ধারণা অমূলক মনে হবে না।

(ক)

শ্রীঅতুল্য ঘোষ এবং শ্রীজওহরলাল নেহরুর মধ্যে পত্র-বিনিময়

প্রিয় পণ্ডিতজী,

আমি রাজ্য কংগ্রেস কমিটির কয়েকজন সদস্যের এবং সেই সঙ্গে আমারও মানসিক অবস্থা আপনার কাছে নিবেদন করছি।

এখন পর্যন্ত যেসব খবর পাওয়া গেছে তাতে আমরা জেনেছি প্রয়াত ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর রোগের গুরুতর অবস্থার কথা কাশ্মীর সরকারের কর্তৃপক্ষকে ২২ তারিখ ভোরবেলায় জানানো হয়। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, তাঁর পরিবারবর্গকে অথবা তাঁর চিকিৎসক ডাঃ বি. সি. রায়কে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কোন খবর পাঠালেন না। কাশ্মীর সরকারকে দায়িত্বজ্ঞানহীন বলে মনে হয়।

যেভাবে ডঃ মুখার্জীর বাড়িতে খবরটি দেওয়া হয় তা অত্যন্ত আপত্তিকর। টেলিফোনে জাস্টিস রমাপ্রসাদ মুখার্জীকে একটি সংবাদে জানানো হয়—ডঃ এস. পি. মুখার্জী মারা গেছেন। এটি বলা হয় চাঁচাছোলা ভাবে এবং ঐসঙ্গে আর কোন খবর দেওয়া হয় নি। মনে হয় বৃদ্ধা জননীর মানসিক অবস্থার কথা চিন্তা করা হয় নি। আপনি জানেন প্রয়াত ডঃ মুখার্জী একজন বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন এবং সারা ভারতে না হলেও অন্ততঃ আমাদের রাজ্যে তিনি ছিলেন অত্যন্ত সম্মানিত ব্যক্তি। সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবর থেকে জানা যায়, তাঁর চিকিৎসার ব্যাপারে তাঁকে কোন সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয় নি, তিনি যে অসুস্থ ছিলেন সে সম্বন্ধে তাঁর ছেলেমেয়েদের কাকেও কোন খবর দেওয়া হয় নি, বন্দী অবস্থায় পীড়িত থাকাকালীন তাঁকে দেখে যাবার জন্য

তাঁর পরিবারের লোকজনের কাছে অনুরোধ পাঠানো হয় নি। আমাদের রাজ্যে জন-অসন্তোষ খুবই উত্তুঙ্গে। আমি আপনাকে কোন কিছু উপদেশ দিতে চাই না, তবে আমার মনে হয়, ডঃ জয়াকর বা শ্রীকুঞ্জরু অথবা সুপ্রীম কোর্টের বিচারকের মত বেসরকারী বিখ্যাত ব্যক্তিদের দ্বারা কিছু একটা তদন্তের ব্যবস্থা হলে আমাদের পক্ষে ভাল হয়। অবশ্য এই পরিস্থিতি কিভাবে সামাল দেওয়া যাবে সেটা আপনি সব থেকে ভাল জানেন।

আমি এই চিঠির একটি প্রতিলিপি ডাঃ বি. সি. রায়কে পাঠাচ্ছি।

পন্ডিত জওহরলাল নেহরু — আপনার অন্তরঙ্গ
প্রধানমন্ত্রী — অতুল্য ঘোষ
ভারত সরকার, নয়া দিল্লী

(খ)

নয়া দিল্লী
জুলাই ২, ১৯৫৩

প্রিয় অতুল্যবাবু,

আপনার ২৯ শে জুন তারিখের চিঠি আমি পেয়েছি। ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর মৃত্যুতে বাংলার যে অসন্তোষ দেখা দিয়েছে তা আমি জানি। আমার মনে হয় তার কারণ প্রধানতঃ প্রকৃত ঘটনা না জানার জন্য। আমি এই ব্যাপারগুলি সযত্নে পর্যালোচনা করেছি এবং আমার নিশ্চিত ধারণা এই যে, কাশ্মীর সরকারের পক্ষে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের প্রতি সৌজন্য ও বিবেচনা দেখানোর ব্যাপারে তাঁদের যতটুকু সাধ্য ছিল তা তাঁরা করেছেন। কাশ্মীর সরকারের স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীশ্যামলাল সরফ কতগুলি তথ্যসহ একটি বিবৃতি দিয়েছেন, তা আজকে সংবাদপত্রে বেরিয়েছে। এটা নিশ্চয় আপনার নজরে পড়বে। আমার মতে কাশ্মীর সরকারের মনোভাব কাণ্ডজ্ঞানহীন ছিল একথা বলা খুবই অন্যায় হবে। তাঁদের মনোভাব ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত।

কাশ্মীরে আটক হওয়ার প্রথম থেকেই ডঃ মুখার্জীর প্রতি অত্যন্ত ভদ্র ব্যবহার করা হয়। একটি সুন্দর বাংলো তাঁর জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছিল। বাস করার জন্য সারা ভারতে এর চেয়ে ভাল ব্যবস্থা আর কেউ পেতে পারেন না। বাংলোটির সামনেই ছিল লেক এবং কাছেই ছিল একটি বিখ্যাত মোগল গার্ডেন। যাঁরা ডঃ মুখার্জীর সঙ্গে ছিলেন অথবা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন, তাঁরা প্রত্যেকেই কাশ্মীর সরকার ডঃ মুখার্জীর সুবিধা ও স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য যেভাবে ব্যবস্থা করেছিলেন তার উচ্চ প্রশংসা করেছেন।

২২ তারিখে যখন তিনি সামান্য অসুস্থ বোধ করেন, তখনও কেউ সন্দেহ করে নি যে তাঁর পীড়া গুরুতর ছিল। যাতে আরও ভালভাবে তাঁর চিকিৎসা হয়, সেজন্য তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানকার ডাক্তাররা তাঁর পরিবারবর্গকে খবর পাঠাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ডঃ মুখার্জী নিজেই তাঁদের খবর দিতে নিষেধ করেন এবং তিনি কলকাতায় তাঁর

পরিবারবর্গের তিনজনের কাছে টেলিগ্রাম পাঠান। এই টেলিগ্রামগুলি যে পাঠানো হয়েছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। আমি মূল টেলিগ্রামগুলির ফটোস্টাট কপি দেখেছি। আপনি বুঝবেন, এ ব্যাপারে কাশ্মীর সরকার বা ডাক্তারের দোষের কিছু নেই। পরে ঐদিনই সন্ধ্যায় ডঃ মুখার্জীর কৌঁসিলী ত্রিবেদী তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসেন, কথাবার্তা বলেন ও তাঁকে কিছু কাগজপত্র দেখান। তখনও পর্যন্ত কেউ কোনরকম বিপজ্জনক ঘটনা ঘটতে পারে এমন সন্দেহ করে নি। রাত ১১টা নাগাদ তাঁর শরীরের অবনতি হতে থাকে। চিকিৎসকরা সর্বদাই হাজির ছিলেন। অবস্থার সামান্য উন্নতি হয়, তারপর আবার খারাপ হতে থাকে। কাশ্মীর সরকারের এক মন্ত্রীকে খবর পাঠানো হয়। তিনি শোনামাত্র তাড়াতাড়ি শয্যাত্যাগ করে ভারতীয় সৈনিক হাসপাতালে ছুটে যান ডাক্তার আনতে। শ্রীনগরে সব কিছুই বড় দূরে দূরে। ডাক্তাররা যখন এসে পৌঁছলেন তখন শ্যামাবাবুর একেবারে শেষ অবস্থা বা মারাই গেছেন।

আমি জানি না এর চেয়ে আর কি করা যেতে পারত। বলা যেতে পারে, সংবাদটি রাত্রে আরও কিছু আগে দেওয়া যেত। কাশ্মীর সরকারের কেউই মধ্যরাত্রির অনেক পরেও এই গুরুতর পরিণতির কথা জানতে পারেন নি।

জাস্টিস মুখার্জীকে টেলিফোনে যেভাবে সংবাদটি জানানো হয় আপনি তার উল্লেখ করেছেন। আসলে টেলিফোনে যোগাযোগ করতেই অনেকক্ষণ সময় চলে যায়। যখন সেটা পাওয়া গেল, শুনতে না পাওয়ার জন্য সরাসরি কথা বলা সম্ভব হল না। মন্ত্রী শ্রীদুর্গাপ্রসাদ ধর, যিনি শ্রীনগর থেকে টেলিফোন করছিলেন, শেষ পর্যন্ত দিল্লীর টেলিফোন কর্মীকে কলকাতার টেলিফোন অপারেটারকে খবরটি জানাতে বলেন, সে-ই জাস্টিস মুখার্জীর কাছে সংবাদটির পুনরুক্তি করে। আপনি ভালভাবেই জানেন, দুবার 'রিলে' করে পাঠানোর ফলে মূল সংবাদের কি অবস্থা ঘটে। ফলে এটির বিকৃতি ঘটে এবং সংক্ষিপ্ততম আকারে সংবাদটি দেওয়া হয়। আমার সঙ্গে দুর্গাপ্রসাদ ধরের কথা হয়েছে। তিনি একটি দীর্ঘ বার্তা পাঠিয়েছিলেন বলেছেন, কিন্তু স্বাভাবিক কারণেই তা খণ্ডিত বা বিকৃত ভাবে পৌঁছেছে। আমি নিশ্চিত যে জাস্টিস মুখার্জীকে যদি সমস্ত ব্যাপারটি জানানো হয়, তাহলে তিনি বুঝবেন যে আদৌ কোন অসৌজন্য প্রকাশের ইচ্ছা ছিল না। প্রকৃতপক্ষে কাশ্মীর সরকারের মন্ত্রীরা শ্যামাবাবুর মৃত্যুতে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েন। তাঁরা তাঁকে শীঘ্রই মুক্তি দেবার কথা ভাবছিলেন।

শ্রী অতুল্য ঘোষ
সভাপতি পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি
৫৯-বি চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা—২০

আপনার অন্তরঙ্গ
স্বাঃ জওহরলাল নেহরু

(গ)

লেডি মুখার্জী এবং শ্রীজওহরলাল নেহরুর মধ্যে পত্রবিনিময়

পত্র নং ৪৯৯—পি. এম.—নয়া দিল্লী, জুন ৩০, ১৯৫৩

প্রিয় শ্রীমতী মুখার্জী,

কিছুদিন আগে যখন আমি জেনেভা থেকে কায়রো রওনা হচ্ছি, সে সময়ে আপনার পুত্র ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের পরলোকগমনের সংবাদ শুনে মর্মাহত হই। সংবাদটি আমায় আঘাত হেনেছিল, কারণ রাজনীতিতে আমাদের মধ্যে মতবিরোধ থাকলেও আমি তাঁকে শ্রদ্ধা করতাম, ভালওবাসতাম। আপনি তাঁর মা, আপনার কাছে এ আঘাত অত্যন্ত বেশী এবং আপনার দুঃখ লাঘব করার মত কোন ভাষা আমার নেই।

আমি কায়রো থেকে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়কে একটি তারবার্তা পাঠিয়ে আপনাকে আমার গভীরতম সমবেদনা ও সান্ত্বনা জানাতে বলি। শ্যামাবাবুর মৃত্যু আমার কাছে আরও দুঃখের বিশেষ করে এই কারণে যে এটা ঘটল তাঁর বন্দীদশায়। প্রায় পাঁচ সপ্তাহ আগে যখন আমি কাশ্মীর যাই, তখন আমি বিশেষ করে তাঁকে কোথায় রাখা হয়েছে এবং তাঁর শরীর কেমন আছে সে বিষয়ে খোঁজখবর নিয়েছিলাম। আমাকে জানানো হয়, তাঁকে কোন কারাগারে না রেখে শ্রীনগরে বিখ্যাত ডাল লেকের ধারে একটি প্রাইভেট বাংলোতে রাখা হয়েছে। আমি দেখলাম কাশ্মীর সরকার তাঁকে যথাসম্ভব আরাম ও সুবিধা দেবার জন্য তৎপর এবং তাঁর স্বাস্থ্য ভাল আছে। আমি তখন এ খবর শুনে সন্তুষ্ট হই। আসলে আমি আশা করেছিলাম, কাশ্মীরের স্বাস্থ্যকর জল-হাওয়ায় শ্যামাবাবুর স্বাস্থ্যের উন্নতি হতে পারে।

কিন্তু তা হবার নয়, এবং সেইজন্যই আঘাত ও দুঃখ আরও বেশী করে লাগে।

আমার মনে হয়, মানুষের সাধ্য ও ক্ষমতায় আর কিছু করার ছিল না এবং আয়ত্তাতীত পরিস্থিতির কাছে আমাদের হার মানতে হয়।

শ্রদ্ধেয়া ভদ্রমহোদয়া, আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার ও আমার দুঃখ নিবেদন করছি। আপনার কোন সেবায় আমার প্রয়োজন হলে আপনি নির্দ্ধিধায় আমাকে জানাবেন।

ভবদীয়

স্বাঃ জওহরলাল নেহরু

(ঘ) ৭৭ আশুতোষ মুখার্জী রোড
কলকাতা
৪ঠা জুলাই, ১৯৫৩

প্রিয় শ্রীনেহরু,

আপনার ৩০শে জুন তারিখের চিঠি ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় আমার কাছে ২রা জুলাই তারিখে পাঠিয়েছেন।

আপনার সান্ত্বনা ও সমবেদনার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাই।

আমার প্রিয় সন্তানের তিরোধানে সমস্ত জাতি শোকমগ্ন। সে শহীদের মৃত্যু বরণ করেছে। আমি তার মা, আমার কাছে এই দুঃখ এত গভীর ও পবিত্র যে তা প্রকাশ করা সম্ভব নয়। আমি আপনার কাছ থেকে কোন সান্ত্বনা পাবার জন্য এ চিঠি লিখছি না। আপনার কাছে আমার যেটা দাবি সেটা হচ্ছে ন্যায়বিচার। আমার পুত্র বন্দীদশায় মারা গেছে—যে বন্দীদশার আগে কোন বিচার হয় নি। আপনার চিঠিতে আপনি বোঝাতে চেষ্টা করেছেন যে, কাশ্মীর সরকারের যা যা করা উচিত ছিল সবই করেছিল। কাশ্মীর সরকার আপনাকে যে সংবাদ দিয়েছে তারই ভিত্তিতে আপনি ও-কথা বলেছেন।

আমি প্রশ্ন করি, যেসব লোকদের নিজেদের বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়ানোর কথা, তাদের কাছে থেকে পাওয়া সেই সংবাদের মূল্য কি? আপনি বলেছেন, আমার পুত্রের বন্দিত্বকালে আপনি কাশ্মীর গিয়েছিলেন। তার প্রতি আপনার ভালবাসা ছিল তাও বলেছেন। আমি জানি না, আপনার তার সঙ্গে দেখা করে তার স্বাস্থ্য ও তার জন্য কিরূপ ব্যবস্থা করা হয়েছে সে সম্বন্ধে খোঁজখবর নিয়ে নিশ্চিন্ত হতে কি বাধা ছিল?

তার মৃত্যু রহস্যাবৃত। এটা কি অত্যন্ত বিস্ময়কর ও আঘাতজনক নয় যে, তার বন্দী হওয়ার পরে তার প্রথম সংবাদ কাশ্মীর সরকারের কাছ থেকে আমি, তার মা, যা পেলাম তা হোল যে আমার ছেলে আর নেই, এবং সে সংবাদও পেলাম সব শেষ হয়ে যাবার দুই ঘন্টা পরে? আর কি নিষ্ঠুর সংক্ষিপ্ত ভাবেই না সংবাদটি পাঠানো হয়েছিল! হাসপাতালে ভর্তি করার পর আমার পুত্র যে টেলিগ্রাম করেছিল সেটাও আমাদের কাছে এসে পৌঁছল তার নিদারুণ মৃত্যুসংবাদের পর। বন্দী হওয়ার পর থেকেই যে আমার পুত্রের শরীর খারাপ যাচ্ছিল এ ব্যাপারে নিশ্চিত ও সঠিক সংবাদ আছে। সে পর পর কয়েকবারই এবং বেশ কিছুদিনের জন্যে নিশ্চিতভাবেই অসুস্থ হয়ে পড়ে। আমি জিজ্ঞাসা করি, কাশ্মীর সরকার অথবা আপনার সরকার কোন সংবাদই আমাকে বা আমাদের আত্মীয়বর্গের কাউকে পাঠায় নি কেন?

যখন তাকে হাসপাতালে পাঠানো হল, তখনও তারা খবরটি আমাদের বা ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়কে অবিলম্বে জানানো প্রয়োজন বোধ করে নি। এটাও দেখা যাচ্ছে যে, কাশ্মীর সরকার শ্যামাপ্রসাদের স্বাস্থ্যের পূর্ব ইতিহাস জানার এবং তার সেবা ও প্রয়োজনের সময়ে আপৎকালীন চিকিৎসার ব্যবস্থা নিতে কোন গা করে নি। তার পুনঃ পুনঃ অসুস্থতার ধাক্কাকেও গুরুত্ব

দেওয়া হয় নি। এর ফল হল মারাত্মক। আমি স্পষ্ট সাক্ষ্য প্রমাণ দিয়ে প্রতিপন্ন করতে পারি, আমার পুত্রের নিজের কথাতেই, ২২ তারিখ ভোরবেলায় সে অবসন্ন বোধ করেছিল। আর সরকার কি করেছিলেন? চিকিৎসার ব্যবস্থা হতে অযথা বিলম্ব, অত্যন্ত অবিবেচকের মত ব্যবস্থা করে তাকে হাসপাতালে পাঠানো, হাসপাতালে তার কাছে তার দুই সহবন্দীকেও থাকতে না দেওয়া সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের হৃদয়হীন আচরণের কয়েকটি জ্বলন্ত নিদর্শন।

শ্যামাপ্রসাদের চিঠিগুলি থেকে এলোমেলো ভাবে কতকগুলি বেছে নিয়ে, তার থেকে আবার বিক্ষিপ্ত ভাবে কিছু মন্তব্য উদ্ধার করে "তার স্বাস্থ্য ভাল ছিল" বলে কাশ্মীর সরকার এবং তাদের ডাক্তারদের দায়-দায়িত্ব কিছুতেই কোন ভাবেই এড়ানো বা লাঘব করা যাবে না। উদ্ধৃতিগুলির সার্থকতা কি? কেউ কি সত্যি বিশ্বাস করবে যে তার মত লোক আত্মীয়স্বজনবর্গ থেকে দূরে বন্দীদশায় থেকে কখনও তার অসুবিধার কথা বা শারীরিক অসুস্থতার কথা চিঠিতে লিখে জানাবে? সরকারের দায় ছিল অসীম এবং গুরুতর।

তাদের বিরুদ্ধে আমার অভিযোগ যে তারা অবশ্য পালনীয় কর্তব্য করতে ব্যর্থ হয়েছে এবং চূড়ান্ত অবহেলা দেখিয়েছে। আপনি বন্দীদশায় আমার আদরের শ্যামাপ্রসাদকে স্বাচ্ছন্দ্য ও সুযোগসুবিধা দেওয়া হয়েছে বলেছেন। এটা খতিয়ে দেখার বিষয়। কাশ্মীর সরকার তার পরিবারবর্গের সঙ্গে স্বাভাবিক ভাবে চিঠিপত্রের আদান-প্রদান করতে দেওয়ার ভদ্রতাটুকু দেখায় নি। চিঠিগুলি অনেক দিন পর্যন্ত আটকে রাখা হত এবং কতকগুলি রহস্যজনক ভাবে উধাও হয়ে গেছিল। বাড়ির খবরের জন্য, বিশেষ করে তার রুগ্ন কন্যার জন্য এবং এই অধমের জন্য দুশ্চিন্তা তাকে পীড়া দিত। আপনি শুনে অবাক হবেন কিনা জানি না, আমরা ১৫ই জুন তারিখের লেখা চিঠিগুলি পেলাম ২৭শে জুন, সেগুলি কাশ্মীর সরকার ২৪শে অর্থাৎ তার মরদেহ পাঠাবার একদিন পরে ডাকে দিয়েছিলেন। সেই প্যাকেটে আমার এবং এখানকার অন্যান্যদের শ্যামাপ্রসাদকে লেখা চিঠিও আমাদের কাছে ফেরত এসেছে। এগুলি ১১ই এবং ১৬ই জুন শ্রীনগরে পৌঁছলেও তাকে দেওয়াই হয় নি। এটি মানসিক নির্যাতন করার নিদর্শন। সে বারংবার হেঁটে বেড়ানোর জন্য পর্যাপ্ত জায়গা চেয়েছিল। এর অভাবে সে অসুস্থ বোধ করছিল। কিন্তু তাকে বার-বারই প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। এটা কি শারীরিক নির্যাতনের একটা উপায় নয়? আপনি যখন আমাকে বলেন, "তাকে কোন কারাগারে নয়, শ্রীনগরে বিখ্যাত ডাল লেকের ধারে একটি আলাদা বাংলোতে রাখা হয়েছে," তখন আমার মন বিস্ময়ে এবং অপমানে ভরে ওঠে। একটি সামান্য প্রাঙ্গনওলা ক্ষুদ্র বাংলোয় দিবারাত্র একদল সশস্ত্র রক্ষীদের পাহারায় বন্দী থাকা—এই হল তার সেখানকার জীবন। সোনার খাঁচা হলে বন্দী সুখী হয়, এ কথা কি যথার্থ বলে মানা যায়? এ ধরনের নির্লজ্জ প্রচার আমার শুনলেও গা ঘিনঘিন করে। আমি জানি না তার কি চিকিৎসা বা সেবাযত্ন হয়েছিল। আমি শুনেছি সরকারী খবরগুলি সব পরস্পর-বিরোধী। বিখ্যাত চিকিৎসকেরা তাঁদের মন্তব্যে বলেছেন, এটা আর কিছু না হোক চূড়ান্ত অবহেলার নিদর্শন। ব্যাপারটির পুঙ্খানুপুঙ্খ এবং নিরপেক্ষ তদন্ত হওয়া প্রয়োজন।

আমি এখানে আমার প্রিয় পুত্রের মৃত্যুর জন্য বিলাপ করছি না। স্বাধীন ভারতের এক নির্ভীক সন্তান বন্দী অবস্থায় বিনাবিচারে চরম শোচনীয় এবং রহস্যজনক পরিস্থিতিতে মৃত্যুবরণ করেছে। সেই মহান প্রয়াত বীরের মা হিসেবে আমি অবিলম্বে নিরপেক্ষ ও যোগ্য ব্যক্তিদের দ্বারা সম্পূর্ণ অপক্ষপাত এবং প্রকাশ্য তদন্তের দাবি করছি। যে জীবন চলে গেছে তা আর কিছুতেই আমাদের ফিরিয়ে দেওয়া যাবে না তা আমি জানি। কিন্তু যা আমি অবশ্যই চাই তা হল স্বাধীন ভারতে এই যে বিরাট শোচনীয় ঘটনা ঘটে গেল তার প্রকৃত কারণগুলি এবং আপনার সরকারের তাতে কি ভূমিকা ছিল, ভারতের জনগণ নিজেরা তার বিচার করুক। কোথাও যদি কোন ব্যক্তি অন্যায় করে থাকে,—যত উঁচুপদেই সে ব্যক্তি অধিষ্ঠিত হোক্ না কেন,—তার সঠিক বিচার হোক এবং জনগণ সতর্ক হোক যেন স্বাধীন ভারতে আর কোন জননীকে আমার মত দুঃসহ মানসিক যন্ত্রণায় ও দুঃখে অশ্রুপাত করতে না হয়।

আপনি দয়া করে বলেছেন, আপনার কাছে কোন সেবা বা সাহায্যের দরকার হলে যেন নির্দ্বিধায় আপনাকে জানাই। আমার এবং ভারতের জননীদের পক্ষ থেকে এটাই আমার দাবি, সত্যকে উদ্ভাসিত করার কাজে ঈশ্বর আপনার সহায় হোন।

চিঠি শেষ করার আগে একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয়ের উল্লেখ করব। কাশ্মীর সরকার শ্যামাপ্রসাদের যেসব জিনিস ফেরত পাঠিয়েছেন তার ভিতর তার ব্যক্তিগত ডায়েরী এবং হাতে লেখার কাগজপত্র আসে নি। বক্সী গোলাম মহম্মদ এবং আমার জ্যেষ্ঠপুত্র রমাপ্রসাদের মধ্যে যে পত্রালাপ হয়েছে তার প্রতিলিপি এই সঙ্গে দিলাম। আপনি যদি কাশ্মীর সরকারের কাছ থেকে পাণ্ডুলিপিগুলি এবং ডায়েরীটি উদ্ধার করে দেন, তাহলে বিশেষ অনুগৃহীত থাকব। এগুলি নিশ্চয় তাদের কাছে আছে।

আশীর্বাদান্তে

আপনার শোকমগ্ন
যোগমায়া দেবী

(৬) নয়া দিল্লী ৫ই জুলাই, ১৯৫৩

প্রিয় শ্রীমতী মুখার্জী,

আপনার ৪ঠা জুলাইয়ের চিঠির জন্য ধন্যবাদ। চিঠিটি এইমাত্র আমার কাছে এসেছে। প্রিয় পুত্রের মৃত্যুতে জননীর দুঃখ ও মানসিক যন্ত্রণা কি হয়, তা আমি ভালই বুঝতে পারি। যে আঘাত আপনি পেয়েছেন, আমার কোন কথাতেই তার উপশম হবে না।

ডঃ শ্যামাপ্রসাদের বন্দীদশা এবং তাঁর মৃত্যুর ব্যাপারে যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গে অনুসন্ধান না করে আমি আপনাকে লিখতে সাহস করি নি। তার পরেও যাঁদের কিছু প্রকৃত ঘটনা জানার সুযোগ হয়েছিল তাঁদের কয়েকজনকেও জিজ্ঞাসাবাদ করেছি। আমি এইটুকু বলতে পারি যে রহস্যের কিছু ছিল না এবং ডঃ মুখার্জীকে যে সব রকম সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়েছিল সে বিষয়ে আমার পরিষ্কার ও যথার্থ (clear and honest) ধারণা জন্মেছে।

কাশ্মীরে চিঠিপত্র বিমানে যায়, কিন্তু আবহাওয়ার গোলমালে বিমান চলাচল খুবই অনিয়মিত এবং কখনও কখনও এক সপ্তাহ বা তারও বেশী বন্ধ থাকে। সত্য বলতে কি বর্তমানেই এক সপ্তাহের ওপর বিমান চলাচল বন্ধ আছে, যে কারণে আমি যে সব জরুরী চিঠি পাঠিয়েছি সেগুলি পৌঁছতে দেরি হচ্ছে।

জেলে আমার দশবছর জীবন কেটেছে এবং ভারতের নানা ধরনের অসংখ্য কারাগারে আমাকে থাকতে হয়েছে এবং সেই জন্যেই বন্দীর মনের অবস্থা কি হয় এবং বন্দীদশার অবস্থা সাধারণত কি রকম হয় সে সম্বন্ধে আমার কিছু জানা আছে।

ডঃ মুখার্জী হঠাৎ যেদিন মারা গেলেন, কাশ্মীর সরকারের এক মন্ত্রী জাস্টিস মুখার্জীকে টেলিফোন করার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি দীর্ঘসময় ধরে চেষ্টা করেও লাইন পান নি এবং তার পরেও সরাসরি কথা বলতে পারেন নি। দুজন টেলিফোন অপারেটর মারফৎ তাঁর কথা 'রিলে' করে পাঠানো হয় এবং নিঃসন্দেহে সেগুলি সম্পূর্ণ বিকৃত হয়ে পৌঁছেছিল।

ডঃ মুখার্জীর ডায়েরী এবং অন্যান্য কাগজপত্রের জন্য আপনি যে অনুরোধ করেছেন সেটি বক্সী গোলাম মহম্মদের কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি। আমি নিশ্চিত তাঁর কাছে কোন কাগজপত্র যদি থেকে থাকে তাহলে তিনি নিশ্চয়ই সেগুলি পাঠিয়ে দেবেন।

ভবদীয়
জওহরলাল নেহরু

(চ)

৭৭ আশুতোষ মুখার্জী রোড কলকাতা, ৯ই জুলাই, ১৯৫৩

প্রিয় মিঃ নেহরু,

আপনার ৫ই জুলাইয়ের চিঠি আমার কাছে ৭ তারিখে পৌঁছেছে।

আপনার চিঠিটি গোটা পরিস্থিতির ব্যাপারে এক দুঃখজনক ভাষ্য। আপনার মনোভাব রহস্য অনাবৃত করার ব্যাপারে সাহায্য না করে বরং রহস্যকে আরও ঘনীভূত করে তুলেছে। আমি প্রকাশ্য তদন্ত চেয়েছিলাম, আপনার পরিষ্কার ও যথার্থ ধারণা জানতে চাই নি।

সমস্ত ব্যাপারটির বিষয়ে আপনার মনোভাব এখন সর্বজনবিদিত। ভারতের জনগণকে এবং আমাকে, শ্যামাপ্রসাদের মাকে, এর যাথার্থ্য বিশ্বাস করাতে হবে। বহু লোকের মনে সন্দেহ দানা বেঁধেছে। যা দরকার তা হোল অবিলম্বে প্রকাশ্য ও অপক্ষপাত তদন্ত।

আমার চিঠিতে উল্লিখিত নানা বিষয়ের উত্তর পাই নি। আমি আপনাকে পরিষ্কার জানিয়েছিলাম যে কতকগুলি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক এবং প্রয়োজনীয় তথ্য প্রতিপন্ন করার মত নিশ্চিত সাক্ষ্যপ্রমাণ আমার কাছে আছে। আপনি সেগুলি জানাতে বা দেখতে আগ্রহী নন। আপনি জানিয়েছেন যে, ''যাদের প্রকৃত ঘটনা কিছু জানার সুযোগ হয়েছিল তাদের কয়েকজনকে'' জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন। এটা আশ্চর্য লাগে যে আমরা—তার পরিবারবর্গ যে বিষয়টির ওপর কিছু আলোকপাত করতে পারি তা গণ্য করা হল না। এবং এতৎসত্ত্বেও আপনি আপনার ধারণাকে 'যথার্থ' বলেছেন।

কাশ্মীরে বিমান ডাকের অনিয়মিত চলাচলের যে কথা আপনি উল্লেখ করেছেন তা এখানে খাটে না। তাতে বহুক্ষেত্রে অপরিমিত বিলম্ব এবং চিঠিপত্রের সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার ব্যাখ্যা হয় না। আপনি যদি আমার চিঠিটি মন দিয়ে যত্ন সহকারে পড়ার কষ্টটুকু স্বীকার করতেন, আমি নিশ্চিত যে তাহলে আপনি এই রকম বাজে অজুহাত দিতে ইতস্তত করতেন। আমাদের কাছে যে চিঠিগুলি আছে তার খামের ওপর ডাকঘরের ছাপের তারিখগুলিই নিশ্চিতভাবে বর্তমান ক্ষেত্রে আপনার ধারণাকে ভ্রান্ত প্রতিপন্ন করছে।

জেলে আপনার অভিজ্ঞতার কথা সকলেই জানে। এটা এক সময়ে আমাদের বিরাট জাতীয় গর্ব ছিল। কিন্তু আপনি কারাগারের যন্ত্রণা ভোগ করেছেন বিদেশী শাসনাধীনে আর আমার ছেলে বিনা বিচারে বন্দীদশায় মৃত্যুবরণ করল এক জাতীয় সরকারের আমলে। যদি ব্রিটিশ শাসনাধীনে কারান্তরালে এইরকম শোচনীয় এবং রহস্যময় সমাপ্তি ঘটত তাহলে কি হত?

আপনাকে আর বেশি কিছু লেখা বৃথা। আপনি প্রকৃত ঘটনার সম্মুখীন হতে ভয় পাচ্ছেন। আমার পুত্রের মৃত্যুর জন্য আমি কাশ্মীর সরকারকে দায়ী করছি। আপনার সরকারকে এই অপকর্মের অংশীদার হিসেবে অভিযুক্ত করছি। আপনি আপনার হাতে যা বিপুল ক্ষমতা তার সব কিছু দিয়ে বেপরোয়া প্রচার চালাতে পারেন, কিন্তু সত্য নিজে তার প্রকাশের পথ খুঁজে নেবেই, এবং একদিন আপনাকে ভারতবাসীর কাছে এবং স্বর্গে ঈশ্বরের কাছে এর জন্যে জবাবদিহি করতে হবে।

আমি আমাদের পত্রালাপ সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য পেশ করছি। প্রধানমন্ত্রী যখন অকৃতকার্য হন, তখন ভারতবাসীই বিচার করুক ও যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নিক। (সূত্রঃ শ্যামাপ্রসাদের ডায়েরী ও মৃত্যু প্রসঙ্গ—উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়)

আপনার শোকমগ্না
যোগমায়া দেবী

সন্তানহারা শোকসন্তপ্ত জননীর এই নীরব অশ্রুপাত ও নির্বাক অভিশাপই নেহরু-গান্ধী পরিবারে একের পর এক অপঘাত মৃত্যুর কারণ নয় তো?

শ্রীজয়প্রকাশ নারায়

প্রজা সোস্যালিস্ট নেতা শ্রী জয়প্রকাশ নারায়ণ গতকাল এখানে (লখনৌ) বলেন যে, ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের স্বাস্থ্য সম্পর্কে যত্ন নেওয়ার বিষয়ে কাশ্মীর সরকারের অবহেলা আইনের দৃষ্টিতে অপরাধ হিসাবে গণ্য হওয়ার যোগ্য।

প্রজা সোস্যালিস্ট দলের নেতা তাঁর বিবৃতিতে বলেন, "আমার অত্যন্ত দুঃখ হয় যখন আজ সকালের সংবাদপত্রে দেখি, প্রধানমন্ত্রী শ্রী অতুল্য ঘোষের পত্রের উত্তরে জোর দিয়ে বলছেন, ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর চিকিৎসার ব্যাপারে কাশ্মীর সরকার কোন অবহেলা করেন নি।

"আমি জানি না প্রধানমন্ত্রীকে কি তথ্য পেশ করা হয়েছে। কিন্তু আমি যে সব তথ্য জানি তা থেকে সম্পূর্ণ বিপরীত সিদ্ধান্তেই উপনীত হতে হয়।

"তিন দিন আগেই আমি কলকাতায় ছিলাম। তখন ডঃ মুখার্জীর পরিবারবর্গের কাছে শোকসান্ত্বনা ও প্রয়াত নেতার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে যাবার সুযোগ ঘটে।

"সেই সময় জাস্টিস রমাপ্রসাদ মুখার্জী আমাকে সমস্ত ব্যাপারটা বলেন, যা প্রখ্যাত বিচারক বলেই তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করতে সক্ষম হয়েছেন। ঐ ঘটনা শুনে আমার মনে কোন সন্দেহই নেই যে কাশ্মীর কর্তৃপক্ষ শ্যামাপ্রসাদবাবুর স্বাস্থ্যের ব্যাপারটা শুধু অবহেলা বললে ঠিক হবে না, অপরাধজনক অবহেলা করেছেন। আমি নিশ্চিত যে আরও একটু যত্ন নিলে এই মহান ভারতীয়র জীবন রক্ষা সম্ভব হত।"

শ্রী জয়প্রকাশ নারায়ণ আরও বলেন, "আমার মনে হয় এরূপ একটি জাতীয় শোকাবহ ঘটনার পর ভারত সরকার অন্তত সমস্ত ব্যাপারটির একটি সঠিক ও নিরপেক্ষ তদন্ত করতে পারতেন। ইতিমধ্যে প্রধানমন্ত্রীর এরূপ একটি বিতর্কিত বিষয়ে রায় দেওয়া এবং যাদের কঠোর শাস্তি হওয়া উচিত ছিল তাদের দোষ ঢাকার চেষ্টা করা উচিত হয়েছে বলে মনে হয় না।"

শ্রী নারায়ণ বলেন, এই ব্যাপারে তাঁর কিছু বলার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু তাঁর আশঙ্কা হচ্ছে যে প্রধানমন্ত্রীর মন্তব্য প্রকাশ হওয়ার ফলে এক দারুণ অন্যায়কে প্রশ্রয় দেওয়া হবে যার প্রকাশ্য প্রতিবাদ করা প্রয়োজন বলে তিনি মনে করেন।

—হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড, তারিখ ৯।৭।৫৩

শ্রী এন. সি. চ্যাটার্জী—

মুসৌরী, জুলাই ৯—শ্রী চ্যাটার্জী আজ রাত্রে এখানে এক বিবৃতিতে বলেন, অপরাধ-বোধ না থাকলে কোন সরকারেরই অন্তরীণ অবস্থায় কোন বন্দীর মৃত্যুর ব্যাপারে নিরপেক্ষ দাবিকে বাধা দেওয়া উচিত নয়।

শ্রী চ্যাটার্জী বলেন, বিভিন্ন ঘটনাবলী প্রকাশ পাওয়ার ফলে দিন দিন ডঃ মুখার্জীর মৃত্যুর

রহস্য ঘনীভূত হচ্ছে। এই মহান ভারতীয় যে সরকারের কার্যধারার প্রতিবাদ করেছিলেন এবং বাধা দিয়েছিলেন, সেই সরকারেরই অবহেলার ফলে তাঁর মূল্যবান জীবন বিনষ্ট হয়েছে, এই কারণে জনসাধারণের মনে গভীর সংশয় জেগেছে। তদন্তের দাবির ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী সাড়া না দেওয়ায় এবং কাশ্মীর সরকারের অনুকূলে তাঁর একতরফা রায় ঘোষণার ব্যাপারে শ্রী জয়প্রকাশ নারায়ণ যে দৃঢ় মন্তব্য করেছেন তার সঙ্গে লক্ষ লক্ষ লোক একমত। দেশ এই রায় মানতে রাজী নয়।

শ্রী চ্যাটার্জী বলেন, তদন্তের দাবি কেবল তথাকথিত সাম্প্রদায়িকরা নয়, শ্রী পুরুষোত্তমদাস ট্যাণ্ডন, আচার্য কৃপালনী, ডাঃ বি. সি. রায় এবং ডাঃ জয়াকর এর মত বিখ্যাত ব্যক্তিরাও করেছেন। প্রধানমন্ত্রী শ্রী নেহরুর বোঝা উচিত যে জনসাধারণের মনে এই সন্দেহ গভীরভাবে গেঁথে গেছে যে শ্রীনগরে ডঃ মুখার্জীকে কারারুদ্ধ করার ব্যাপারে শেখ আবদুল্লার সঙ্গে তাঁর সরকারও সমানভাবে দায়ী।

পূর্ণ দায়িত্ব নিয়েই আমি এই মন্তব্য করছি যে প্রাথমিক দৃষ্টিতে (প্রাইমা ফেসি) এটি মারাত্মক অবহেলার পরিণতি। শেখ আবদুল্লাও এটি বুঝেছেন, তা না হলে তিনি ডাঃ রায়কে শ্রীনগরে এসে এ ব্যাপারে তদন্ত করার জন্য বলতেন না।

সরকারের উচিত অবিলম্বে স্বাধীনভাবে তদন্ত করার জন্য একটি কমিশন গঠন করা, কারণ ডাঃ রায় বেশ কিছুকালের জন্য বাইরে যাচ্ছেন।

শিরোমণি অকালী দল—

[শিরোমণি অকালী দলের প্রেসিডেন্ট মাস্টার তারা সিংয়ের সভাপতিত্বে শিরোমণি অকালী দলের ওয়ার্কিং কমিটির অমৃতসরে ১২.৭.৫৩ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় গৃহীত প্রস্তাব থেকে উদ্ধৃতি]

অবিলম্বে স্বাধীনচেতা ও যোগ্য ব্যক্তিদের দ্বারা সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ এবং খোলাখুলি ভাবে তদন্তের যে দাবী ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর মাতৃদেবী করেছেন, তার প্রতি শিরোমণি অকালী দল তাদের দৃঢ় সমর্থন জানাচ্ছে।

ডাঃ নলিনীরঞ্জন সেনগুপ্ত, এম. ডি —

কাশ্মীর সরকারের প্রেস রিপোর্টে ডাঃ মুখার্জীর মৃত্যুবিষয়ক যে মেডিক্যাল রিপোর্ট প্রদত্ত হয়, সেগুলি বিশ্লেষণ করে ডাঃ নলিনীরঞ্জন সেনগুপ্ত নিম্নলিখিত মন্তব্য করেন।

১। জাস্টিস শ্রীরমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নিকট থেকে এবং সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবর থেকে জানা গেছে যে, তাঁর অসুস্থতার প্রথম ১০ দিনের মধ্যে কোন চিকিৎসার ব্যবস্থা হয় নি। অন্তত চিকিৎসার কোন সংবাদ পাওয়া যায় নি। আরও ভালভাবে চিকিৎসার জন্য ডাঃ মুখার্জীকে ভারতে পাঠানো উচিত ছিল অথবা ভারত থেকে তাঁর চিকিৎসার ব্যাপারে দ্রুত সাহায্য চেয়ে পাঠানো উচিত ছিল।

২। ডাঃ মুখার্জীকে অসুস্থতার প্রথম ১০ দিনের মধ্যেই আরও ভাল পরিবেশে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া উচিত ছিল।

৩। ২০শে জুন সকালবেলা তাঁর ড্রাই প্লুরিসি হয়েছে নির্ণীত হয়। জুন ২০-২১ রাত্রি তাঁর তীব্র অনিদ্রা ও অস্থিরতায় কাটে। এতৎসত্ত্বেও দেখা যাচ্ছে, তারপর সারাদিন বা রাত্রে, ২২ তারিখে ভোর চারটেয় যখন তিনি গুরুতর হৃদ্‌রোগের আক্রমণে প্রায় অজ্ঞানের মত হয়ে যান, ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁর সর্বাক্ষণিক চিকিৎসার বন্দোবস্ত রাখার কোন ব্যবস্থা করা হয় নি। প্রেস বিবৃতিতে দেখা যায়, জেল কর্তৃপক্ষকে খবর দেবার পরেও সকাল সাড়ে সাতটা পর্যন্ত কোন ডাক্তার আসেন নি।

৪। ডাঃ মুখার্জীর রোগটি ছিল স্পষ্টতই করোনারী থ্রম্বসিস। ২০ তারিখ সকাল থেকে ২৩ তারিখ ভোর ৬টা পর্যন্ত তাঁর মৃত্যুর পরেও, কাশ্মীরে সরকারী মহলে ধারণা ছিল ডাঃ মুখার্জী প্লুরিসি রোগে মারা গেছেন, করোনারী থ্রম্বসিসে নয়। সুতরাং ডাক্তার রোগটাকে করোনারী থ্রম্বসিস বলে নির্ণয় করেছিলেন, এ কাহিনী হয় সাজানো ব্যাপার নয়তো এ বিষয়ে কোন গুরুত্বই দেওয়া হয় নি। এটি মনে হয় এই ঘটনা থেকে যে, যখন রোগীকে সকাল সাড়ে সাতটাতেই যথোপযুক্ত চিকিৎসা করে চাঙ্গা করে তুলতে হয়েছিল, তারপরে তাঁকে শহর থেকে ১০ মাইল দূরে নিয়ে যাওয়া হলো, করোনারী রোগের ক্ষেত্রে যা এক অভাবনীয় ব্যবস্থা। ঘটনাবলীর বিবরণ দেখে বোঝা যায়, ডাক্তার কখনই এটি করোনারী রোগ বলে ধরতে পারেন নি এবং সমস্ত কিছু ঘটার পর এই রোগের কথা মনে হয়েছে।

৫। যে মানুষটি স্পষ্টই এইরকম গুরুতর রোগে আক্রান্ত হয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, তাঁকে এমন লোকদের তত্ত্বাবধানে রাখা—যারা এরকম গুরুতর রোগ নির্ণয় করতে পারে না এবং নির্ণয় করার পরেও রোগীকে হাতুড়ের মত চিকিৎসা করে, এটি মারাত্মক ত্রুটি, যার ফলে নিশ্চিতভাবে রোগীর জীবননাশ ঘটল এবং এ ব্যাপারটি ক্ষমা করার বা অব্যাহতি দেওয়ার কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না।

৬। চিকিৎসারত ডাক্তাররা বইয়ে করোনারী থ্রম্বসিসে যে চিকিৎসা-ব্যবস্থা দেওয়া আছে তাই হুবহু উল্লেখ করে গেছেন কিন্তু মরফিন অ্যান্টি-কোয়াগুলাণ্ট দেওয়া হয়েছিল কিনা তা একবারও উল্লেখ করেন নি। কোন উপযুক্ত চিকিৎসকই অ্যান্টি-কোয়াগুলাণ্ট ছাড়া করোনারী থ্রম্বসিসের চিকিৎসার কথা ভাবতে পারেন না। এবং মরফিন হচ্ছে এই রোগে আমাদের প্রধান প্রতিরক্ষা। পেথিড্রিন হচ্ছে এর অনুপযুক্ত বিকল্প, এবং সেটাও দেওয়া হয়েছে রাত ১টায়, আক্রমণের ১৮ ঘণ্টা পরে। সুতরাং এসব দেখে মনে হয়, চিকিৎসক এই রোগটি যে করোনারী থ্রম্বসিস তা বুঝতে পারেন নি, অথবা বুঝতে পারলেও এই রোগের আধুনিক চিকিৎসার বিষয়ে তিনি এমনই অজ্ঞ যে তাঁর হাতে করোনারী থ্রম্বসিসের রোগীকে চিকিৎসার ভার দেওয়া যায় না।

৭। যদি করোনারী থ্রম্বসিস বলেই রোগটি নির্ণীত হয়ে থাকে, তাহলে চিকিৎসার সহায়ক হিসাবে অনেক প্রক্রিয়াব ব্যবস্থা করা যেত, কিন্তু তার কোনটাই করা হয় নি।

ডাঃ অমলকুমার রায়চৌধুরী, এম. ডি.—

ডাঃ অমলকুমার রায়চৌধুরী তাঁর মন্তব্যে বলেন, তাঁর মনে হয়েছে, চিকিৎসারত ডাক্তারদের রোগনির্ণয়ে ভুল হয়েছে। কাশ্মীর সরকারের প্রেস বিবৃতি পড়ে তিনি নিম্নলিখিত মন্তব্যটি করেন ঃ—

ড্রাই প্লুরিসি প্রকৃতপক্ষে হৃৎপিণ্ডের প্লুরা পর্যন্ত স্ফীতিব্যাপ্তির পরোক্ষ পরিণতি। সেজন্য মনে হয় হৃৎপিণ্ডের গোলযোগ কয়েকদিন আগেই শুরু হয়েছিল। আসলে অসুখের আক্রমণজনিত স্ফীতির ব্যাপ্তি এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় ছড়াতে কিছু সময় লাগে। ড্রাই প্লুরিসি নিউমোনিয়া রোগেরও পরোক্ষ পরিণতি হতে পারে। আর এই দুটি রোগই নিউমোনিয়া এবং করোনারী—বিশেষ করে এই বয়সের রোগীর, যাঁর করোনারী রোগ আক্রমণের পূর্ব ইতিহাস আছে—তাঁর ক্ষেত্রে খুবই গুরুতর।

তাঁর বন্দী-নিবাস থেকে দশ মাইল দূরের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার আগে তাঁর বসা এবং অর্ধশয়ান অবস্থায় নাড়ীর গতি, ব্লাডপ্রেসার এবং শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি মাপা হয় নি বলেই মনে হচ্ছে। হাসপাতালে নিয়ে যাবার আগে এগুলি দেখা খুবই উচিত ছিল।

চিকিৎসার বিষয়ে, ইলেক্ট্রো-কার্ডিওগ্রাফ রিপোর্ট অনুযায়ী যদি এটা করোনারী রোগের আক্রমণই ছিল, তাহলে এই আঘাত সামলাবার সর্বোত্তম চিকিৎসা-ব্যবস্থা পেথিডিন ইন্‌জেক্‌শন নয়, মরফিন জাতীয় আরও শক্তিশালী ওষুধ, অবশ্য যদি সেসব ওষুধে প্রতিক্রিয়াজনিত সমস্যা না হয়। তারপর প্রোথ্রমবিন টাইমও (প্লাজমায় যে প্রোটিন থাকে, তা থ্রমবিন-এ পরিণত হয়ে রক্তকে জমাট করার সময়) গণনা করা উচিত ছিল এবং অ্যামিনোফিলিনের পরিবর্তে ইন্‌জেক্‌শন ও অ্যান্টি-কোয়াগুলাণ্ট ওষুধ দেওয়া উচিত ছিল। পেথিডিন দেওয়া হয়েছিল রাত ১টায়। পেথি ডিন আদৌ দিতে হলে তা দেওয়া উচিত ছিল যখন হৃৎপিণ্ডের সংলগ্ন স্থানেন্ত্রানা দেখা দিল তখনই। (প্রেস বিবৃতি অনুযায়ী) তার বেশ কয়েক ঘণ্টা পরে নয়।

তারপর রক্ত ও প্রস্রাব পরীক্ষার বিশদ কোন বিবরণ নেই। এই ধরনের রোগের আক্রমণে যখন ব্লাডপ্রেসার নেমে যায় এবং নাড়ীর গতি দ্রুত হয়, তখন সাধারণত ইন্‌ট্রাভেনাস ইন্‌জেক্‌শনে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়।

সেজন্য মনে হয়, চিকিৎসায় নিশ্চয়ই কোথাও বিভ্রান্তি ঘটেছিল এবং এই রোগীর ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয় নি।

—হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড, ২৮শে জুন, ১৯৫৩

পরিশিষ্ট - ১

বংশলতিকা

বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় (আদিতে জিরেট নিবাসী
(১৭৮৭ - ১৮৪৯)
= ব্রহ্মময়ী

দুর্গাপ্রসাদ ১৮৩২-১৯০৫ | হরিপ্রসাদ ১৮৩৪-১৮৯৯ | গঙ্গাপ্রসাদ ১৮৩৬-১৮৮৯ | রাধিকাপ্রসাদ ১৮৩৯-১৮৯৪

গঙ্গাপ্রসাদ = জগত্তারিণী ১৮৫০ - ১৯১৪

আশুতোষ ১৮৬৪-১৯২৪ = যোগমায়া ১৮৭২-১৯৫৬ | হেমন্তকুমার | হেমলতা ১৮৭৪-১৯০৩ = সতীশচন্দ্র রায়

আশুতোষ ও যোগমায়ার সন্তান:

কমলা ১৮৯৫-১৯২৩ = শুভেন্দুশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় = ব্রজেন্দ্রলাল কাঞ্জিলাল | রামপ্রসাদ ১৮৯৬-১৯৮৪ = তারা দেবী | শ্যামাপ্রসাদ ১৯০১-১৯৫৩ = সুধা দেবী | উমাপ্রসাদ ১৯০২-১৯৯৭ | অমলা ১৯০৫-১৯৫০ = প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় | বামাপ্রসাদ ১৯০৬-১৯৮৩ = কুন্তলা | রমলা ১৯০৮ = অনাথনাথ চট্টোপাধ্যায়

শ্যামাপ্রসাদ ও সুধা দেবীর সন্তান:

অনুতোষ = মীরা | সবিতা = নিশীথরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় | আরতি = পরেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য | দেবতোষ = আভা

পরিশিষ্ট—২

শ্যামাপ্রসাদ ও সুভাষচন্দ্র ঃ জহরলাল নেহরুর ক্ষমতা লালসার শিকার

১৯৫৩ সালের ২৩শে জুন যে ভয়ংকর রহস্যজনকভাবে ডঃ শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যু ঘটান হল, তার তদন্তের দাবী করেছিলেন বৃদ্ধা জননী যোগমায়া দেবী। কিন্তু সচেতন অপরাধীর হৃদয় কেমন করে সেই ন্যায্য দাবী মেনে নেবে? তাঁর এই বর্বর হৃদয়হীনতাই প্রমাণ করে যে তিনি ও শেখ আব্দুল্লা এক জঘন্য ষড়যন্ত্র করে এক পরম সম্ভাবনাময় মহান্ নেতাকে বেঁচে থাকতে দেননি। ইতিহাস তাঁদের এই হীন চক্রান্তকে কোন দিন ক্ষমা করবে না।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র ও শ্যামাপ্রসাদ। বাংলা মায়ের দুই নয়ন মণি। ভারত মাতার কণ্ঠ হারের দুটি শ্রেষ্ঠ মণি। দেশের জন্য দু'জনই জীবন দিয়ে গেলেন, একজন স্বদেশে, আরেকজন বিদেশে। কিন্তু দু' জনের অকালে জীবনদীপ নির্বানের সঙ্গেই নেহরু প্রত্যক্ষ ভাবে জড়িত। একজনের মৃত্যুর কারণ , স্থান ও কাল উদ্ঘাটন করতে নয়, চাপা দিতে একেএকে তিনটি তদন্ত কমিটি গড়া হয়েছে। আরেকজনের মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধানে সারা দেশব্যাপী দাবী উঠলেও নেহরুজী তাতে রাজী হননি। কারণ, বিচারকর্তা নিজেই যে আসামীর কাঠগড়ায়।

যা হোক, গত শতাব্দীর চল্লিশের দশক থেকে তাঁর মৃত্যু কাল পর্যন্ত সারা দেশে সঙ্ঘটিত রাজনৈতিক ঘটনাবলী এবং তাতে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার নিম্নরূপ সার সংক্ষেপ করা যায়

শ্যামাপ্রসাদ ও বঙ্গ-বিভাগ ঃ বাঙালীর অস্তিত্ব রক্ষায় শ্যামাপ্রসাদ

১৯৪০ সালে মুসলিম লিগ লাহোর অধিবেশনে দেশভাগের দাবি তোলে। মন্ত্রণাদাতা অবশ্যই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা। কমিউনিস্টরা দুহাত তুলে জিন্নার দাবি সমর্থন করল—"The Pakistan is a just progressive and national demand." এই দাবির সূদুরপ্রসারী প্রতিক্রিয়া অনুধাবন করার দূরদর্শিতা তৎকালীন কংগ্রেস নেতাদের মধ্যে ছিলই না। তখন সুভাষচন্দ্রকে দল থেকে তাড়িয়ে কংগ্রেসি বৃদ্ধের দল আত্মপ্রসাদে মশগুল। আরেক দল পূর্বাপর বিবেচনা না করে মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করার দরুণ মনমরা। মুসলিম লিগের বিভাজন নীতির বিষময় পরিণতি অনুধাবন করার মতো মানসিকতাই তাদের ছিল না।

একমাত্র শ্যামাপ্রসাদের নেতৃত্বাধীন হিন্দু মহাসভাই ১৯৪০ সালেই মুসলিম লিগের লাহোর প্রস্তাবের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়। ঢাকার মিউনিসিপাল ময়দানে অনুষ্ঠিত এক বিশাল জনসভায় শ্যামাপ্রসাদ দেশবাসীকে ঐক্যবদ্ধ হবার জন্য ডাক দিয়েছিলেন। ১৯৪০-৪৩ সালে অমৃতসর, লায়ালপুর, মহাকোশল, বিলাসপুর ভাগলপুর, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি স্থানে অনুষ্ঠিত হিন্দু মহাসভার বিভিন্ন সম্মেলনে পাকিস্তান প্রস্তাবের অযৌক্তিকতা নিয়ে শ্যামাপ্রসাদ নিপুণ বিশ্লেষণ করেন। ব্রিটিশগোয়েন্দা বিভাগের রিপোর্টে তার সাক্ষ্য মেলে—"It was only the Hindu Mahasabha...which reacted sharply against Pakistan."

এই ডামাডোলে ১৯৪৩ সালে মাদ্রাজের প্রবীণ কংগ্রেস নেতা রাজা গোপালাচারী ভারত বিভাগের পরিকল্পনা পেশ করেন। গান্ধী প্রকারান্তরে সি আর ফর্মুলাতেই সম্মতি জানান। ১৯৪৪ সালে জেল থেকে বেরিয়েই তিনি অযাচিতভাবে জিন্নার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে ছুটলেন। শ্যামাপ্রসাদ প্রমাদ গুনলেন। তিনি জানতেন, গান্ধীজি জিন্নার কাছে গিয়ে অপমানজনক শর্তে আত্মসমর্পণ করবেন। কার্যত ঘটেছিল তাই। শ্যামাপ্রসাদ তাঁকে বলেছিলেন তিনি যেন লিগের পুনরুজ্জীবনে সাহায্য না করেন। এবং প্রয়োজন হলে তিনি গান্ধীজির বিরুদ্ধেও জনমত গঠন করবেন। এই পরিস্থিতিতে সরকারি গোপন রিপোর্টে বলা হয়েছে ঃ—It seems clear that Dr. Shyama Prasad Mukherjee puts his case very strongly to Gandhi and did not mince matters. Former is the most determined character who will stick at nothing and I shall say he will get a good deal of support from many Congressmen, especially in Bengal."

১৯৪৪ সালের ১৯ জুলাই শ্যামাপ্রসাদ গান্ধীজিকে এক পত্রে লেখেন—"সত্যি কথা বলতে কি রাজা গোপালচারী জিন্নার কাছে যে সূত্র (Formula) দিয়েছেন, তাতে আমি বিচলিত হয়ে পড়েছি। আমরা হিন্দু-মুসলমান সমস্যার সমাধানে আগ্রহী। কিন্তু গোপালাচারী যেভাবে বিষয়টির ইতি টানতে চাইছেন আমরা তাঁর সাথে একমত নই।.... আমরা আপনাকে কংগ্রেস থেকে আলাদা মনে করি, কিন্তু এ বিষয়ে আপনার অঙ্গীকার আমাদের প্রচণ্ড অস্বস্তিরমধ্যে ফেলেছে।" কিন্তু এসব হিতকথা শোনার মতো মানসিক অবস্থা তখন গান্ধীজি বা কংগ্রেস নেতাদের ছিল না। নেতাজি সুভাষচন্দ্র এবং আজাদ হিন্দ ফৌজের ভয়ে ভীত কংগ্রেস নেতারা যে কোনও শর্তে মুসলিম লিগের সঙ্গে মিটমাট করে সুভাষচন্দ্রের ভারতে আগমনের আগেই দিল্লির গদিতে বসে পড়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। ক্ষুব্ধ দুঃখিত শ্যামাপ্রসাদ বেদনাহত হৃদয়ে তাঁর রোজনামচায় লিখলেন ঃ—

"মুসলিম লীগের শক্তি শুধু ইংরেজ তোষনে বাড়েনি—কংগ্রেস ও তার নেতৃবৃন্দ অনেক সময় লীগের অন্যায় আবদার সহ্য করেছেন,তাকে প্রশ্রয় দিয়েছেন, জিন্নার পায়ের তলায় গান্ধীজি প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা লুটিয়ে পড়েছেন। এই সর্বনাশা তোষণ নীতির ফলে লিগের শক্তি আরও বেড়েছে। .....কংগ্রেস একটা খুব বড় ধাপ্পার আশ্রয় নিয়েছিল। মুখে তারা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে। কিন্তু তারা "Self- determination for territorial unity" মানতে প্রস্তুত এবং কাউকে তারা জোর করে ভারতে রাখতে চায় না। .... কংগ্রেস আত্মনিয়ন্ত্রণ হিসেবে পুরো Sind, N. W. F., আধা পাঞ্জাব এবং Bengal দিতে রাজী—আমরা এর ঘোর প্রতিবাদ করি। কারণ তা হলে দেশ যে টুকরো করা যাবে— এটা মেনে নেওয়া হল।"

দেখা যাচ্ছে যে, বাংলা ও বাঙালির ভবিষ্যৎ নিয়ে কংগ্রেসের কোনও মাথাব্যথা নেই। গান্ধীজি সমেত কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ পুরো বাংলা পাকিস্তানে গেলেও তজ্জন্য উদ্বিগ্ন নন। বরং আপদ বিদায় হলেই তারা বাঁচেন। ৬ জানুয়ারি ১৯৪৬ কংগ্রেসের তরফ থেকে কেবিনেট মিশনের প্রস্তাবের বিরোধিতা করে যে মন্তব্য করা হয়েছিল সেখানে অসম, সীমান্ত প্রদেশ

এবং শিখদের প্রসঙ্গ থাকলেও বাংলার ৪৫% হিন্দুর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তারা নীরব। এর পরেই ঘটল কলকাতা ও নোয়াখালির প্রলয়ঙ্কর দাঙ্গা। হিন্দুর ধনপ্রাণ গেল, নারীজাতির মান ইজ্জত গেল।

ধূর্ত মাউন্টব্যাটনের দূতিয়ালি ও কংগ্রেস নেতাদের ক্ষমতা লোলুপতা দেখে শ্যামাপ্রসাদ আঁচ করতে পেরেছিলেন দেশভাগ হচ্ছেই। দেশভাগের সঙ্গে সঙ্গেই ব্যাপক দাঙ্গা শুরু হবে বাংলা ও পাঞ্জাবে। এ সম্পর্কে তিনি নিঃসন্দেহ হলেন। তাই তিনি দাবি করলেন, দেশভাগ হলে বাংলা এবং পাঞ্জাবও ভাগ করতে হবে। জিন্না বঙ্গবিভাগ প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করেন। তিনি বলেন—"What is the use of Bengal without Calcutta? সুরাবর্দি বলেছিলেন বাংলা ভাগ হতে দেওয়া চলবে না। তাঁকে মদত দেন গভর্নর ফ্রেডেরিক ব্যারোজ, সহযোগী হলেন কমিউনিস্ট পার্টি ও তফসিলি ফেডারেশনের নেতৃবৃন্দ— মুখ্যত যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল। ১৫ মার্চ ১৯৪৭ সালে শ্যামাপ্রসাদ কলকাতায় এক সম্মেলন আহ্বান করেন। এই সম্মেলনে বাঙালি হিন্দুদের জন্য আলাদা হোমল্যান্ডের দাবি করে বাংলাভাগের প্রস্তাব নেওয়া হল। ওই সভায় বিশিষ্ট বাঙালিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ঐতিহাসিক ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার, ডঃ মাখনলাল রায়চৌধুরী, ভাষাতত্ত্ববিদ ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। বাঙালি ভদ্রসমাজ যে বর্বর মুসলিম লিগ শাসনে বাস করতে অনিচ্ছুক বক্তারা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তা ঘোষণা করেন। শ্যামাপ্রসাদ বাংলা ভাগের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করে বলেন, পূর্ব অভিজ্ঞতায় এটা পরিষ্কার প্রমাণিত হয়েছে পাকিস্তানে হিন্দুরা সম্মান নিয়ে বেঁচে থাকতে পারবে না। সেই জন্য তাদের আলাদা হোমল্যান্ড তৈরি না হলে অত্যাচারিত হয়ে তারা অন্য কোথাও আশ্রয়ের অধিকার দাবি করতে পারবে না।

শ্যামাপ্রসাদের সমর্থনে এগিয়ে এসেছিলেন ডঃ মেঘনাদ সাহা, ডঃ যদুনাথ সরকারের মতো মহান বাঙালিরাও। কংগ্রেসের বহু সমর্থক এবং নিচুতলার কর্মীরা শ্যামাপ্রসাদের এই আন্দোলনকে সমর্থন করেন। গান্ধীজী কংগ্রেস কর্মীদের উদ্দেশ্যে বলেন—Condemn the movement of which Syama Prosad Mukherjee and Hindu Mahasabha are chief protagonists."

বঙ্গবিভাগ অনিবার্য দেখে আসরে নামলেন লিগ নেতা, কলকাতার দাঙ্গার নায়ক সুরাবর্দি। তাঁর সঙ্গে হাত মেলালেন কংগ্রেসের কাছে অবাঞ্ছিত শরৎচন্দ্র বসু। সুরাবর্দি প্রস্তাব দিলেন বঙ্গভঙ্গ না করে বাংলা হোক "An independent undivided sovereign Bengal in divided India."

হিন্দুরা সুরাবর্দির ভালমানুষিতে ভুলল না। তাঁর শাসনকালে ব্রিটিশের অধীনে বাংলার হিন্দুদের যে দুর্দশা ঘটেছে, ব্রিটিশের অবর্তমানে ভারতের বাইরে সেই সুরাবর্দির মতো লোকেদের শাসনে হিন্দুদের অন্ধকার ভবিষ্যৎ সহজেই অনুমেয়। তা ছাড়া সুরাবর্দির মতলবও ভাল ছিল না। দিল্লিতে যখন সাংবাদিকরা সুরাবর্দিকে জিজ্ঞাসা করে যে ইংরেজ চলে যাওয়ার পর ভারত

থেকে বিচ্ছিন্ন বাংলা মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে পাকিস্তানে যোগ দেবার সিদ্ধান্ত নেবে না তো? তখন সুরাবর্দি কোনও জবাব না দিয়ে চুপ করে থাকেন। তিনি চেয়েছিলেন আগে স্বাধীন বাংলা হোক, পরে ছলে বলে কৌশলে তাকে পাকিস্তানে ঢুকিয়ে দেওয়া যাবে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে ৪ এপ্রিল ১৯৪৭ তারিখে তারকেশ্বরে Bengal Partion Convention শুরু হয়। শ্যামাপ্রসাদ এই সম্মেলনে বলেন বাংলা ভাগ করা ছাড়া হিন্দু বাঙালির বাঁচার কোনও উপায় নেই। এটা হল বাঙালির জীবন-মরণের প্রশ্ন "It is a question of life and death for us, the Bengalee Hindus, ... We want our homeland and we shall have it-let this be our motto. Now or Never-let this be our slogan."

১৯৪৬ এর ১৬ আগস্ট মুসলিম লিগের ডাকা প্রত্যক্ষ সংগ্রাম (Direct Action)-এর সমর্থনে কমিউনিস্টরা পথে নেমেছে, গান্ধীবাদের নেশায় বুঁদ হয়ে থাকা কংগ্রেসিরা অহিংসার মাহাত্ম্য কীর্তন করছে। নেহরু দিল্লিতে সরকার গঠনে ব্যস্ত। গান্ধীজি হিন্দু মন্দিরে কোরান পাঠ করছেন, আর এই সুযোগে মুসলিম লিগের গুণ্ডাবাহিনী 'কাফের' হিন্দুদের বিরুদ্ধে জেহাদে নেমেছে। তখন লিগের আক্রমণ প্রতিহত করতে এগিয়ে এসেছিলেন শ্যামাপ্রসাদ। আর কোনও দল বা নেতার টিকি সেদিন দেখা যায়নি। ব্যক্তিগত ডায়েরিতে শ্যামাপ্রসাদ লিখেছিলেন— "Force must in the last analysis be met with force. An iternal policy of non-resisteance to armed violence would eventually condemn any society to dissolution." সেদিন 'যেমন কুকুর তেমন মুগুর' নীতি ছাড়া কলকাতার হিন্দুর আর বাঁচার পথ ছিল না।

সুতরাং বাংলা ভাগের পক্ষে জনমত গঠনে শ্যামাপ্রসাদের অগ্রণী ভূমিকার কথা অস্বীকার করার কোনও উপায় নেই। শেষ পর্যন্ত এমন দাঁড়াল যে জনমতের চাপে পড়ে দুই কংগ্রেস নেতা ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ও কিরণশঙ্কর রায় শ্যামাপ্রসাদকে জানালেন, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিকে তাঁরা বঙ্গবিভাগের দাবি মেনে নিতে বলবেন। তাঁরা তা করেও ছিলেন। ফলে পঃবঃ সৃষ্টির নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণে শ্যামাপ্রসাদের অবদান খাটো করে দেখাতে চাওয়া ইতিহাস সম্মত নয়।

পরিশিষ্ট - ৩

ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে লেখা কাজী নজরুল ইসলামের একটি পত্র

মধুপুর, ১৭.৭.৪২

শ্রীচরণেষু,

আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম গ্রহণ করুন। মধুপুরে এসে অনেক relief ও relaxation অনুভব করছি। মাথার যন্ত্রণা অনেকটা কমেছে। জিহ্বার জড়ত্ব সামান্য কমেছে। আপনি এত সত্বর আমার ব্যবস্থা না করলে হয়ত কবি মধুসূদনের মত হাঁসপাতালে আমার মৃত্যু হ'ত। আমার স্ত্রী আজ প্রায় পাঁচ বৎসর পঙ্গু হয়ে শয্যাগত হয়ে পড়ে আছে। ওকে অনেক কষ্টে এখানে এনেছি। ওর অসুখের জন্যই এখনো সাত হাজার টাকার ঋণ আছে। এরমধ্যে মাড়োয়ারী ও কাবলিওয়ালাদের ঋণই বেশী। হক্ সাহেব যখন আমার কাছে এসে কাঁদতে থাকেন যে, "আমায় রক্ষা কর, মুসলমান ছেলেরা রাস্তায় বেরুতে দিচ্ছে না", আমি তখন মুসলিম লীগের ছাত্র ও তরুণদলের লীডারদের ডেকে তাদের শান্ত করি। তারপর Assembly-র সমস্ত মুসলমান মেম্বারদের কাছে আমি আবেদন করি। তাঁরা আমার আবেদন শুনলেন। ৭৪ জন মেম্বার হক্ সাহেবকে সমর্থন করতে রাজি হলেন। "নবযুগের" সম্পাদনার ভার যখন নিই, তার কিছুদিন আগে ফিল্‌মের music-direction -এর জন্য সাত হাজার টাকার কন্ট্রাক্ট পাই। হক্ সাহেব ও তাঁর অনেক হিন্দু-মুসলমান supporters আমায় বলেন যে তাঁরা ও ঋণ শোধ করে দেবেন। আমি Film -এর contract cancel করে দিই। পরে যখন দু'তিন মাস তাগাদা করে টাকা পেলাম না, তখন হক্ সাহেবকে বললাম "আপনি কোন ব্যাঙ্ক থেকে অল্প সুদে আমায় ঋণ করে দিন, আমার মাইনের অর্দ্ধেক প্রতি মাসে কেটে রাখবেন।" হক সাহেব খুশী হয়ে বললেন, "পনের দিনের মধ্যে ব্যবস্থা করব।" তারপর সাতমাস কেটে গেল, আজ নয় কাল করে। তাঁর supporter-রাও উদাসীন হয়ে রইলেন। হিন্দু-মুসলিম ইউনিটির এক লাখ টাকা যখন মঞ্জুর হল, টাকা যখন হক্ সাহেব পেলেন, তখনো তিনি উদাসীন হয়ে রইলেন। আপনি জানেন, secretariat-এ আপনার সামনে হক্ সাহেব বললেন, "কাজীর ঋণ শোধ করে দিতে হবে।" আপনিও আমাকে বললেন, "ও হয়ে যাবে"। আমি নিশ্চিন্ত মনে কাজ করব বললাম। আপনি জানেন, হিন্দু-মুসলমান unity-র জন্য আমি আমার কবিতায়, গানে, গদ্যে দেশবাসীকে আবেদন করেছি। সে লেখা সাহিত্যে স্থান পেয়েছে- সে গান বাঙলার হাটে-ঘাটে, পল্লীতে, নগরে নগরে গীত হয়। আমি হিন্দু-মুসলমান ছাত্র ও তরুণদের সঙ্ঘবদ্ধ করে রেখেছি। যদি হক্ মন্ত্রীত্ব ভেঙ্গে যায়, তা হবে আবার Coalition ministry-র জন্য। হক্ সাহেব একদিন বললেন, "কিসের টাকা?" আমি চুপ করে চলে এলাম। এরপর আর তাঁর কাছে যাইনি। আপনি secretariat-এ যখন বলেছিলেন, "ও হয়ে যাবে" তখন থেকে স্থির বিশ্বাসে বসে রইলাম "আমি নিশ্চয়ই টাকা পাব।" এই Coalition ministry-র একমাত্র আপনাকে আমি অন্তর থেকে শ্রদ্ধা করি, ভালবাসি- আর

কাউকে নয়। আমি জানি- আমরাই এই ভারতবর্ষকে পূর্ণ স্বাধীন করব। সেদিন বাঙালীর আপনাকে ও সুভাষ বসুকেই সকলের আগে মনে পড়বে - আপনারাই হবেন এদেশের সত্যকার নায়ক।

আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ গ্রহণ করবেন। আমি জানি আমি Hindu Muslim Unity Fund থেকে আমার ঋণমুক্তির টাকা পাব। আপনার কথা কখনো মিথ্যা হবে না। পাঁচশ' টাকা পেয়েছি। আরো পাঁচশ' টাকা অনুগ্রহ করে যত শীঘ্র পারেন, পাঠিয়ে দেবেন বা যখন মধুপুরে আসবেন, নিয়ে। কোর্টের ডিক্রির টাকা দিতে হবে। তিন চার মাস দিতে পারিনি। তারা হয়ত Body Wareant বের করবে। আপনার মহত্ত্ব, আমার উপর ভালোবাসা, আপনার নির্ভিকতা, শৌর্য্য, সাহস-আমার অণুপরমাণুতে অন্তরে বাহিরে মিশে রইল।

আমার আনন্দিত প্রণাম - পদ্ম শ্রীচরণে গ্রহণ করুন।

প্রণত

কাজী নজরুল ইসলাম

কি ব্যবস্থা করা যাবে সে বিষয়ে জুলফিকর হাইদারের সঙ্গে কথা হয়েছে। নজরুল সুস্থ হয়ে ফেরত আসে।

—শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

পরিশিষ্ট - ৪

ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জীবনের প্রধান ঘটনাবলী

১৯০১ * জুলাই ৬ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ও যোগমায়া দেবীর ৭৭ নম্বর রসা রোড (বর্তমানে আশুতোষ মুখার্জি রোড) বাসভবনে শ্যামাপ্রসাদের জন্ম।

১৯১৭ * ভবানীপুরের মিত্র ইন্সটিটিউশন থেকে জলপানি সহ ম্যাট্রিক পরীক্ষা পাশ। প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি।

১৯২১ * স্নাতক-বি.এ. ইংরাজি (সাম্মানিক) পরীক্ষায় প্রথমশ্রেণীতে সর্বোচ্চ স্থানাধিকার।

১৯২২ * এপ্রিল ১৬ সুধাদেবীর সঙ্গে পরিণয়।

১৯২৩ * কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভারতীয় ভাষা বিভাগে এম.এ. পরীক্ষায় প্রথমশ্রেণীতে শীর্ষস্থান অধিকার।

১৯২৪ * আইন পরীক্ষায় প্রথমশ্রেণীতে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার। কলিকাতা হাইকোর্টে অ্যাডভোকেট হিসাবে নাম নিবন্ধিত। বিশ্ববিদ্যালয়ে নির্বাচিত ফেলো, পিতৃবিয়োগ (২৫ মে), পিতার শূন্য স্থানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেট সদস্যপদে মনোনীত।

১৯২৬ * আইন পাঠের উদ্দেশ্যে বিলেত যাত্রা-কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত Conference of Universities of the British Empire সম্মেলনে যোগদান (জুলাই)।

১৯২৭ * ব্যারিস্টারি পরীক্ষা পাশ।

১৯২৯ * কংগ্রেস প্রার্থী হিসাবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কন্সটিটুয়েন্সি থেকে বঙ্গীয় প্রাদেশিক আইনসভার কাউন্সিলে নির্বাচিত।

১৯৩০ * আইন অমান্য আন্দোলনের সূচনায় কংগ্রেসের আইনসভা বর্জনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাউন্সিল থেকে পদত্যাগ—নির্দল প্রার্থী রূপে পুনরায় নির্বাচিত।

১৯৩৩ * পত্নী বিয়োগ।

১৯৩৪-৩৮ * উপাচার্য, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। ইন্টার-ইউনিভার্সিটি বোর্ড-এর সদস্য ও পরে সভাপতি।

১৯৩৭ * বিশ্ববিদ্যালয় কন্সটিটুয়েন্সি থেকে প্রাদেশিক আইনসভার অ্যাসেমব্লিতে নির্বাচিত।

১৯৩৮ * কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে সাম্মানিক ডি.লিট উপাধিতে ভূষিত। বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে একই সময়ে সাম্মানিক এল.এল.ডি. ডিগ্রি প্রদান।

১৯৩৯ * বিপ্লবী বীর সাভারকারের সঙ্গে পরিচয়।

১৯৪০-৪৪ * নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভার কার্যনির্বাহক সভাপতি, বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দুসভার সভাপতি।

১৯৪১ * ডিসেম্বর ১১, ফজলুল হকের নেতৃত্বে গঠিত মন্ত্রীসভায় অর্থসচিবের দায়িত্ব গ্রহণ।

ডিসেম্বর * ভাগলপুরে হিন্দু মহাসভার অধিবেশনের ওপর সরকারী নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে সভাপতিরূপে যোগ দিতে যাওয়ার পথে Defence of India Rules-এ গ্রেপ্তার ও পরে মুক্তিলাভ। ক্রিপস মিশন আলোচনায় যোগদান।

১৯৪২ ✱ বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় সমস্যার সমাধানের উদ্দেশ্যে বড়লাট লর্ড লিনলিথগোকে চিঠি। কারারুদ্ধ মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাতের অনুমতি সরকার কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত। অগাস্ট আন্দোলনে মেদিনীপুর এবং দেশের অন্যান্য জায়গায় সরকারী দমননীতি ও দেশবাসীর ওপর নির্যাতনের প্রতিবাদে মন্ত্রীত্ব ত্যাগ, গবর্ণরের কাছে প্রেরিত পদত্যাগ পত্রের প্রকাশ সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ।

১৯৪৩ ✱ পঞ্চাশের মন্বন্তরে বাংলায় দুর্ভিক্ষ পীড়িতের সেবায় অক্লান্ত পরিশ্রম ও সেবাসংঘ সংগঠন। নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভার অমৃতসর অধিবেশনে সভাপতিত্ব। রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গলের সভাপতি (১৯৪৩-'৪৫)।

১৯৪৪ ✱ ইংরাজী দৈনিক পত্রিকা "ন্যাশনালিস্ট" প্রকাশ ও সম্পাদনা।

১৯৪৬ ✱ বঙ্গীয় বিধানসভায় বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্র থেকে পুনর্নির্বাচিত। কলিকাতায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামাকালে বিপন্নদের সাহায্যদান ও প্রতিরোধের ব্যবস্থা। হিন্দুস্থান ন্যাশনাল গার্ড স্বেচ্ছাসেবক দল সংগঠন। বাংলা থেকে 'Constitutent Assembly' গণ-পরিষদের সদস্য নির্বাচিত। অখণ্ড স্বাধীন বঙ্গভূমি প্রস্তাবের বিরোধিতা। বাংলা ভাগের নায়ক।

১৯৪৭ ✱ স্বাধীন ভারতের প্রথম মন্ত্রীসভায় শিল্প ও সরবরাহ দপ্তরের ভারগ্রহণ। হিন্দু মহাসভাকে রাজনীতি পরিত্যাগ করে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের কর্মসূচী গ্রহণের পরামর্শ দান। মহাবোধি সোসাইটির সভাপতি নির্বাচিত।

১৯৪৮ ✱ মহাত্মা গান্ধীর হত্যার পর হিন্দু মহাসভা তাঁর প্রস্তাব গ্রহণ করে।

১৯৪৯ ✱ হিন্দু মহাসভার মত পরিবর্তন ও পুনরায় রাজনীতিক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়ায় মহাসভার সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছেদ। প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহরুর থেকে বুদ্ধশিষ্য সারিপুত্ত ও মোগললায়নের পূত অস্থি গ্রহণ ও ১৯৫২ সালে সাঁচীতে নবনির্মিত স্তূপে সংস্থাপন।

১৯৫০ ✱ নেহরু-লিয়াকৎ আলি চুক্তি। প্রধানমন্ত্রী নেহরু অনুসৃত পাক-ভারত নীতির প্রতিবাদে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ। বাঙালি উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের চেষ্টায় আত্মনিয়োগ।

১৯৫১ ✱ জনসঙ্ঘ নামে নতুন রাজনৈতিক দল গঠন ও তার সভাপতি পদ গ্রহণ।

১৯৫২ ✱ দক্ষিণ কলিকাতা থেকে সাধারণ নির্বাচনে জয়লাভ করে প্রথম লোকসভার সদস্যপদ লাভ। লোকসভায় ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক পার্টি নামে বিরোধী দলের প্রতিষ্ঠা। বর্মা, কাম্বোজ প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ, কানপুরে জনসঙ্ঘ সম্মেলনে সভাপতিত্ব।

১৯৫৩ ✱ কাশ্মীর সমস্যা বিষয়ে পণ্ডিত নেহরুর সঙ্গে বিরোধ। দিল্লীর চাঁদনীচকে শোভাযাত্রার ওপর প্রচারিত নিষেধাজ্ঞা অমান্য করার অভিযোগে গ্রেপ্তার ও কারাবরণ। পরে সুপ্রীম কোর্টের রায়ে মুক্তিলাভ। ১১ই মে কাশ্মীরে প্রবেশ ও কাশ্মীর সরকার কর্তৃক গ্রেপ্তার। ২৩ শে জুন শ্রীনগরে বন্দীদশায় মৃত্যু। ২৪ শে জুন কলিকাতায় প্রেরিত মরদেহের অন্ত্যেষ্টি।

তথ্য সূত্র ও ঋণ স্বীকৃতি

বিগত শতাব্দীর তৃতীয় দশকে বাঙালীর ভাগ্য বিপর্যয়ের সূত্রপাত এবং চতুর্থ ও পঞ্চম দশকে অপরিমেয় রক্তস্রোত ও অশ্রুপ্লাবনে অবগাহনের পরেও সে রক্তক্ষরণ এখনো ক্ষীণধারায় বয়ে চলেছে।

অবিভক্ত ভারতে সর্ব ক্ষেত্রে সর্বাগ্রগণ্য বাংলা ভাষী হিন্দু সম্প্রদায়ের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে স্বাধীনতা পাওয়া গেল বটে, কিন্তু লক্ষলক্ষ সোনার সংসার যে শ্মশানে পরিণত হয়ে গেল, তা নিয়ে কোনও উল্লেখযোগ্য সাহিত্য সৃষ্টি হয়নি; নাটক বা চলচ্চিত্রে তার উপযুক্ত রূপায়ন ঘটেনি। উদ্বাস্তুদের জীবন-জীবিকার সমস্যা, জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবার দুর্জয় সঙ্কল্প নিয়ে এখানে ওখানে যৎকিঞ্চিৎ লেখালেখি হলেও, কেন উদ্বাস্তু হতে হল, তা নিয়ে কাউকে উচ্চবাচ্য করতে দেখা যায়নি। একমাত্র ব্যতিক্রম ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী।

আজকে জীবনের সর্বক্ষেত্রে পর্যুদস্ত বাঙালী সন্তানদের বাঙালী জীবনের চূড়ান্ত অবক্ষয়ের কারণ জানতে হলে সেসব অশ্রুসিক্ত ও রক্তঝরা দিনগুলির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এবং ডঃ শ্যামাপ্রসাদের ভূমিকা সম্পর্কে জানা একান্ত প্রয়োজন এবং তাই নিম্নলিখিত বইগুলি অবশ্য তাদেরকে পড়তে হবে।

১) Leaves from a Diary –Dr. Syamaprasad Mookerjee.
২) শ্যামাপ্রসাদের ডায়েরী ও মৃত্যু প্রসঙ্গ—উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
৩) রাষ্ট্র সংগ্রামের এক অধ্যায় ও পঞ্চাশের মন্বন্তর—ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
৪) শ্যামাপ্রসাদ-ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব—বীরেশ মজুমদার
৫) শ্যামাপ্রসাদ ঃ বঙ্গবিভাগ ও পশ্চিমবঙ্গ — ডঃ দীনেশ চন্দ্র সিংহ
৬) নোয়াখালীর মাটি ও মানুষ — ডঃ দীনেশ চন্দ্র সিংহ
৭) নোয়াখালীর ইতিবৃত্ত — নলিনী রঞ্জন মিত্র
৮) নোয়াখালি ! নোয়াখালি—শান্তনু সিংহ
৯) শ্যামাপ্রসাদ ঃ ব্যর্থ বলিদান---শান্তনু সিংহ
১০) শতবর্ষের আলোয় শ্যামাপ্রসাদ— শ্যামাপ্রসাদ স্মারক সমিতি
১১) কেন উদ্বাস্তু হতে হল---দেবজ্যোতি রায়
১২) দূরদর্শী রাজনীতিক শ্যামাপ্রসাদ---শ্যামলেশ দাশ
১৩) নোয়াখালির দুর্যোগের দিনে—অশোকা গুপ্ত
১৪) ভারতকেশরী শ্যামাপ্রসাদ—সুশান্ত কুমার সাহিত্যরত্ন
১৫) ভারতকেশরী ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়—অধ্যাপক বলরাজ মাধোক
১৬) দ্বিজাতি তত্ত্ব ও বাঙালী—বিনয়ভূষণ ঘোষ
১৭) আম জনতার দরবারে—শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
১৮) শ্যামাপ্রসাদ জন্মশতবর্ষে---অধ্যাপক নিখিলেশ গুহ
১৯) শিক্ষাব্রতী শ্যামাপ্রসাদ ---ডঃ অরুণ সান্যাল
২০) শ্যামাপ্রসাদ কি সাম্প্রদায়িক ? —রমেন দাস

২১) ভারত বিভাজন, যোগেন্দ্রনাথ ও ডঃ আম্বেদকর—বিপদভঞ্জন বিশ্বাস
২২) পাক - ভারতের রূপরেখা - প্রভাস চন্দ্র লাহিড়ী
২৩) শিকড়ের সন্ধানে —কালীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
২৪) দেশ বিভাগের অন্তরালে—কালীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায
২৫) কাশ্মীর মঞ্চে শ্যামাপ্রসাদ —রুদ্রপ্রতাপ চট্টোপাধ্যায়
২৬) মৃত্যুঞ্জয়ী শ্যামাপ্রসাদ ও আজকের পশ্চিমবঙ্গ—অরুণ ভদ্র
২৭) বঙ্গ সংহার এবং —সুখরঞ্জন সেনগুপ্ত
২৮) স্বাধীন বঙ্গভূমি গঠনের পরিকল্পনা ঃ প্রয়াস ও পরিণতি—অমলেন্দু দে
২৯) My People Uprooted-Tathagata Ray
৩০) Dr. Syamaprasad Mookerjee : Selected Speeches in Bengal Legislative Assembly- Asutosh Memorial Institute. – Dr. Reena Bhaduri (edited)
৩১) Dr. Syamaprasad Mookerjee : Kashmir Issue–Correspondence, Speeches and Reports (1947-1953)–Dr. Reena Bhaduri (edited)
৩২) Partition, Bengal and After : The Great Tragedy of India- Kaliprasad Mukhrjee
৩৩) হিন্দু সম্প্রদায় কেন দেশত্যাগ করছে—সালাম আজাদ
৩৪) শ্যামাপ্রসাদ -- কবিশেখর কালিদাস রায়
৩৫) A Phase in the Life of Dr. Syamaprasad Mookerjea; 1937-1946– Dr. Anil Chandra Banerjee.

সস্ত্রীক শ্যামাপ্রসাদ